তপন সিংহ

মনে পড়ে

"ক্যামেরা ইজ রানিং—সাউন্ড ইজ স্টার্টেড"
—এই কথা বলে যে সব বন্ধু চিরকাল আমার হুকুম তামিল করেছেন
তাঁদের হাতে তুলে দিলাম

গোড়ার কথা

'মনে পড়ে' পুরোপুরি আত্মজীবনী নয়। শৈশব থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রকারের দীর্ঘ কর্মজীবনে যেসব ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছি, এই বই মূলত তাঁদের নিয়ে লেখা। সঙ্গে রয়েছে আমার প্রিয়জনদের কথা, কিছু অখ্যাত কিন্তু আমার প্রিয় মানুষের কথাও। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা থাকলেও এই লেখায় অনিবার্যভাবে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমিও কিছুটা থেকে গেলাম, এই মাত্র।

আমি লেখক নই। চলচ্চিত্র নিয়ে টুকরো-টুকরো কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু বই লেখার কথা কোনও দিন ভাবিনি। ১৯৯৩-এর গোড়ায় শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা অবসন্ন বোধ করছিলাম, হাতে কোনও কাজও ছিল না, এই সময় একদিন আমার অনুজপ্রতিম, সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে আমার শৈশব ও ছাত্রজীবনের গল্প করছিলাম। ভাগলপুরের দুর্গাচরণ স্কুলের একদা প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা) যে বেহালা বাজিয়ে গান গেয়ে দরজায় দরজায় ভিক্ষা করে স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন, আমার মুখে এই ঘটনা শুনে দিব্যেন্দু আমাকে 'এইসব নিয়ে' লিখতে বললেন—লিখতে বললেন চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব বিখ্যাত মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি, তাঁদের কথাও।

তখন হাতে কাজ না থাকলেও লেখায় মন সায় দিচ্ছিল না। তবু, তাগাদা এড়াতে না পেরে একদিন কুণ্ঠিত কলমে শৈশবের কথা লিখতে বসলাম, মাসখানেকের চেষ্টায় কয়েক পাতা লিখেও ফেললাম। 'যাঁদের কথা মনে পড়ে' নাম দিয়ে ১১ এপ্রিল ১৯৯৩ সেই লেখা ছাপা হল আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' ক্রোড়পত্রে। প্রকাশের পরে অনেক টেলিফোন ও চিঠি পেয়েছিলাম, অনেকেই বললেন আরও লিখতে। ধীরে ধীরে সেই কাজটুকুই করেছি।

আনন্দ পাবলিশার্সের সৌজন্যে অবশেষে সেই পাণ্ডুলিপি 'মনে পড়ে' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। এই বই যদি পাঠককে তৃপ্তি দেয় তাহলে খুশি হব।

জানুয়ারি ১৯৯৫

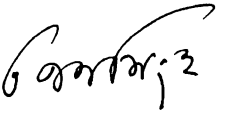

মনে পড়ে

'সপ্তমী অষ্টমী তিথি
হোক মায়ের নিতি নিতি
কাল হবে বিজয়া দশমী গো
ও দুষ্কনাশিনী
মা নাকি যাবে কৈলাসে গো
ও দুষ্কনাশিনী।'

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে দেউড়ির বড় দরজা দিয়ে যখন আমাদের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য বাইরে আনা হত, গ্রামবাসীরা সমস্বরে এই গানটি গাইত। বিসর্জন হত আমাদেরই একটি পুকুরে। নাম 'সিদাগড়'। এর মানে জানা নেই। কোনও পূর্বপুরুষ নাম দিয়েছিলেন কিনা তাও জানি না। প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেলে আমরা সবাই শূন্য বেদির নীচে বসতাম। তখন আমার বয়স ছ-সাত বছর। প্রত্যেকের জন্য একটি শরের কলম আর দোয়াত থাকত। মা সাজিয়ে রাখতেন। মাটিতে বসে আমরা লিখতাম—

'গণেশ গিরিজা কৃষ্ণচন্দ্রাদিত্য মহেশ্বর,
পিতা গুরু পরম ব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমোস্তুতে।'

মা আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বলতেন, ওই দ্যাখ। হাঁদার মতো দেখতাম। সাদা সাদা অনেক মেঘের ভেলা ভেসে চলেছে। বলতেন, পুজো আসছে বুঝতে পারছিস না ?

পুজোর খবর নিয়ে আসত গোপালদা—গোপাল বৈরাগী। সে পুরুষানুক্রমে আমাদের ঠাকুর তৈরি করত। গোপালদা বেছে বেছে আঁটি আঁটি খড় রাখত চণ্ডীমণ্ডপে। তারপর দড়ি আর খড় দিয়ে বেঁধে মূর্তির একটা কাঠামো তৈরি করত। আমি আর আমার বোন গীতা বসে বসে তন্ময় হয়ে দেখতাম। গোপালদা সর্বদা গুনগুন করে গান গাইত। একটি গানের প্রথম লাইন মনে আছে, 'মুন বলে আমি মুনের কথা জানি না।' আমার 'হারমোনিয়াম' ছবিতে এই গানটি পরিমার্জনা করে ব্যবহার করেছিলাম।

গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখার্জি আর অরুন্ধতী দেবী ।

খড়ের উপর দড়ি দিয়ে সরস্বতীর কাঠামো করছে গোপালদার ছেলে বটা । তার আবার একটা চোখ নেই । এমন সময় মাস্টারমশাই ডাকলেন, পড়তে এসো । গীতার বয়স তখন চার । সে তো ভয়ে গুটগুট করে গেল ভেতর-বাড়িতে স্লেট-বই আনতে । আমি একবার মাস্টারমশাইয়ের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে হেলতে দুলতে সোজা মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'আমাদের কি পুজোর ছুটি হবে না ?' মা আমার কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলেন । বাধ্য হয়ে বই খাতা নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের মুণ্ডপাত করতে করতে পড়ার ঘরে ঢুকলাম ।

সেই সময় আমাদের বাড়িতে থাকত গোটা চল্লিশেক মানুষ । মা একমাত্র মহিলা এবং কর্ত্রী । এমনই ছিল তাঁর কাজের শৃঙ্খলা যে সবাইকে বেলা বারোটার মধ্যে খেয়ে নিতে হত । কাজের লোকজন খেত বেলা একটার মধ্যে । তারপর মা আর সংসারের কর্ত্রী নন । সোজা উপরে গিয়ে 'ভারতবর্ষ' বা 'প্রবাসী' খুলে বসতেন । বেলা আড়াইটে নাগাদ আসত পোস্টাপিসের ডাক পিওন হরেনদা । তার খাবার থাকত । মা হরেনদার খাবারের সামনে একবার এসে দাঁড়াতেন । খেয়েদেয়ে গ্রামান্তরে চিঠি বিলি করতে ছুটত হরেনদা ।

বাবার চোখে মায়ের চরিত্রের দুটি দোষ বিশেষ ভাবে ধরা পড়ত । এক, মানুষকে ডেকে ডেকে খাওয়ানো । আর, যদি কোনও মেয়ে মাথায় করে মাছ বা তরিতরকারি বিক্রি করতে আসত তবে মা সবটাই কিনে নিতেন । কেউই ফিরে যেত না । বলতেন, একটি মেয়ে মাথায় বোঝা নিয়ে রোদ-বৃষ্টিতে পাঁচগ্রাম ঘুরে বেড়াবে, অসভ্য দেশ না হলে এরকম হয় ।

মায়ের শরীরে ছিল লর্ড সিনহা বংশের রক্ত । সুতরাং অজ পাড়াগাঁয়েও আধুনিকতার হাওয়া আনতে চেষ্টা করতেন । যারা কলেজে পড়ত, তারা পুজোয় বা গরমের ছুটিতে দেশে এলে তাদের দিয়ে রাজবংশী পাড়াতে নাইটস্কুল করাতেন । সেই সঙ্গে নির্দেশ দিতেন সন্ধ্যায় কোনও খড়ের বাড়ির চাল দিয়ে যদি ধোঁয়া উঠতে না দেখা যায়, তা হলে বুঝতে হবে সে বাড়িতে খাবার নেই । প্রয়োজনীয় চাল-ডাল যেন মায়ের কাছ থেকে নিয়ে যায় ।

আমাদের গ্রামটি ছিল বিহার বীরভূম আর মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে । গ্রীষ্মে প্রচণ্ড শুকনো গরম । বিকেল থেকে বালতি বালতি জল ছাদে ঢালা হত ঠাণ্ডা করার জন্য । তারপর রাতে লম্বা লম্বা বিছানা করে ছাদে শোওয়া, দিল্লিতে যেমন হয় । ছাদে শোওয়া ছিল একটা বিলাস । বাবাকে কোনও দিন ভেতর-বাড়িতে শুতে দেখিনি । বাইরের বাড়িতেই থাকতেন । তাঁর তদারক করত ফণিদা আর হাকিমদা, মানে হাকিম শেখ । ছ' ফুট লম্বা জোয়ান, লাল টকটকে গায়ের রঙ, এক পাঠান । হাতে সাত ফুট লম্বা তেল

চুকচুকে মোটা লাঠি। আরও কিছু কাজের লোকজন থাকত। সকলের নাম মনে নেই।

তারা ভরা আকাশের নীচে শুয়ে মা গোপাদিকে গান শেখাতেন—

'যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিভে যায় বারে বারে—'

আরও একটু বড় হয়ে ওই একই রাতের তারার নীচে শুয়ে শুয়ে আমি শিখেছিলাম 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না—'। গীতাকে গানের মাস্টারমশাই এসে গান শেখাতেন। পাশের ঘরে থেকে সেসব গান টপাটপ তুলে নিতাম আমি।

সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে, গোপালদা খড়ের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপ দিতে দিতে গুনগুন করে গান গাইছে আর গীতা অনবরত প্রশ্ন করে চলেছে গোপালদাকে। গোপালদা বলত, কাজের সময় কথা বললে প্রতিমার গড়নে খুঁত থেকে যাবে। আবার মাস্টারমশাইয়ের ডাক। সবিস্ময়ে দেখলাম, তাঁর হাতে টিনের ছোট বাক্স, জামা কাপড় পরে বাড়ি যাবার জন্য তৈরি। আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোমাদের দেড় মাস ছুটি। বছরে একবার পুজোর আগে নিজের বাড়ি যেতেন মাস্টারমশাই। ফিরতেন সেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরে। তখন পুজোর আনন্দ আর ছুটির আনন্দ মিলেমিশে একাকার।

বাইরের বাড়িতে যেমন ফণিদা সর্বেসর্বা—তেমনই ভেতর-বাড়িতে রাইচরণদা। আমাদের জলখাবারের ব্যবস্থা ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ তাঁর। গলায় কণ্ঠির মালা, অবিবাহিত। পুজোর আরতির সময় দারুণ খোল বাজাতেন। মহিলাদের মধ্যে কাজ করত চিরসা ও সুবাসদি। সুবাসদির কটা চোখ, সাদা ধবধবে গায়ের রঙ, কথার চেয়ে বেশি কাজ সারত ইঙ্গিতে।

আমাদের বাইরের বাড়ির শেষ সীমানায় একটা ছোট্ট ঘর ছিল। তার নাম পাঁঠা-বাঁধা ঘর। বলিদানের জন্য অনেক পাঁঠা আনা হত, তাদের কনডেম্‌ড্ সেল। এক নির্জন দুপুরে দেখি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সুবাসদি। একটু পরেই ফণিদা। দু' একদিন পর শুনলাম ফণিদা মায়ের কাছে আবদার করেছে সুবাসদিকে বিয়ে করবে। মা বললেন, 'তোমার তো আগের বউ বোষ্টুমী হয়ে কার সঙ্গে কণ্ঠি বদল করে চলে গেছে। সুবাসও বিধবা। চলো কলকাতায় কালীঘাটে গিয়ে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দিই।'

ফণিদা তাতে রাজি নয়। সে সবাইকে জানিয়ে বন্ধুবান্ধবদের ভোজ দিয়ে বিয়ে করতে চায়। ফলে পাল্কি বের করার হুকুম হল। ফণিদা সেই পাল্কি চেপে স্যাঙাতদের নিয়ে সুবাসদির ছোট্ট মাটির ঘরে বিয়ে করতে গেল সদর্পে। এরপর থেকে ফণিদা সুবাসদির বাড়িতেই থাকত।

গোপালদার হাতে প্রতিমায় দু-মাটির প্রলেপ লাগার পর কলকাতায় রওনা হয়ে যেতেন বাবা। জওহরলাল পান্নালাল থেকে বাড়ির সকলের পুজোর জামাকাপড় আসবে। বাবা ফিরে এলে বুঝতাম সত্যি-সত্যিই পুজো এসে গেল।

তারপর একদিন পটুয়ারা আসত প্রতিমা রঙ করতে। এই পটুয়ারা ধর্মে মুসলমান। বংশ পরম্পরায় প্রতিমা রঙ করে আসছে। মা তাদের ভেতর-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। প্রথমেই প্রতিমার গায়ে রঙ চড়ানো হত। সাদা রঙ। তারপর আট-দশটা নারকেলের মালায় গোলা হত আরও কত রকমের রঙ। ক্রমশ রঙিন হয়ে উঠত মাটির প্রতিমা। আমাকে আর গীতাকে সে-জায়গা থেকে কেউ নড়াতে পারত না। সত্যিই সে এক বিস্ময়!

তবে দুর্গা প্রতিমার চোখ আঁকবার বা 'চক্ষুদানের' সময় পটুয়ারা কাউকে দেখতে দিত না। বাঁ হাতে একটা কেরোসিনের লম্ফ নিয়ে ডান হাতে নিবিড় একাগ্রতার সঙ্গে আঁকত প্রতিমার চোখ। তারপর সাদা নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত। চোখ আঁকবার আগে, আমার বেশ মনে পড়ে, পটুয়া খানিকক্ষণ নীরবে চোখ বন্ধ করে বসে থাকত, তারপর হাত দিত তুলিতে।

সবচেয়ে অবাক হতাম চালচিত্র আঁকা দেখে। রাত আটটা নাগাদ চালচিত্রের উপর সরু সরু অজস্র দাগ টানত। নানা রঙের। এরপর আর দেখার সুযোগ হত না। আমাদের শোবার জন্য চলে যেতে হত উপরে। সকালে দেখতাম পরম বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য—স্বপ্নে জড়ানো কত সে মূর্তির ছবি। লম্ফ হাতে সারারাত ধরে এঁকেছে। আগের দিনের শূন্য সাদা চালচিত্রে যেন রঙ-বেরঙের ফুল ফুটেছে রাতারাতি।

আর সকলের বাবারা যেমন হন—আমার বাবাও ছিলেন সেইরকমই। সন্তান হিসাবে তাঁর বহু কীর্তিকলাপ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মনে আছে তাঁর কুমির শিকার।

আমাদের অনেকগুলি পুকুর ছিল। প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা নাম। যেমন বাড়ির সংলগ্ন পুকুরটির নাম ছিল 'রানা'। তার পরেরটি 'সদাগড়'। তার পরে 'ব্রজের পুকুর'। গ্রামের একেবারে শেষ সীমানায় 'ময়দান দীঘি'। তার পরেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নিচু জমি, তা প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বর্গমাইল হবে। ভরা ভাদরে ভাগীরথীর উপচে পড়া জলে এই সমস্ত এলাকা ডুবে যেত। লোকে বলত বান এসেছে।

এই বানের জল থেকেই একবার একটি কুমির এ পুকুর সে পুকুরের মাছ খেয়ে একেবারে আমাদের বাড়ির সংলগ্ন রানা পুকুরে হাজির হল। সকালে দেখা যেত তার বিশাল দেহ নিয়ে মাঝ পুকুরে ভেসে আছে। পুকুরটিও বেশ বড়, ঝিলের মতো। অজস্র মাছ তাতে। বাবা উঠে পড়ে লাগলেন,

কুমিরটিকে মারতে হবে। কুমির শিকারের এমন সুবিধা আর কোথায় পাওয়া যাবে !

নিমতিতা থেকে কুমির-ধরা বঁড়শি এল। একটা লম্বা বাঁশে মোটা দড়ি বেঁধে বঁড়শি লাগানো হল। তাতে টোপ হল পাঁঠার নাড়ি-ভুঁড়ি। ঘণ্টা কয়েক পর দেখা গেল, বাঁশটি বিশাল পুকুরের চার পাড়ে ভাসতে ভাসতে ছুটছে। ঘণ্টাখানেক এইরকম হওয়ার পর বাঁশটি আস্তে আস্তে স্থির হয়ে গেল।

এরপর বাবার আবির্ভাব হল, হাতে দোনলা বন্দুক। হাকিমদার হাতে একগাদা টোটা। মেলার মতো গ্রামবাসীদের ভিড়। বাবা হুকুম দিলেন, ভিড় সরাও। তখন সবাই দূরে সরে গেল। জেলে রেণু হালদার ডোঙায় চেপে আস্তে আস্তে বাঁশটা ডাঙার কাছে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-ছ' জন জোয়ান বাঁশটা ধরে টানতে লাগল। বন্দুকে টোটা ভরে এগিয়ে গেলেন বাবা। পিছনে ফণিদা, হাকিমদা, রাইচরণদা। হাকিমদা পিছন থেকে দু'হাত বাড়িয়ে আগলে রেখেছে বাবাকে, যাতে গুলি বের হওয়ার সময় বন্দুকের রিকয়েল-এ পড়ে না যান। কুমিরকে টেনে পাড়ের কাছে আনতেই প্রলয় শুরু হয়ে গেল। জলে প্রচণ্ড আলোড়ন, ল্যাজের ঝাপটা, সমগ্র পরিস্থিতি ভয়াবহ। কুমিরটা হঠাৎ মুখ উঁচু করে বিরাট হাঁ করে এগিয়ে এল সামনে। মুখটা ডাঙায়, শরীর জলে, মাত্র হাত দুয়েক দূরে বাবা। তিনি টিপ করে বন্দুকের নলটা বাড়িয়ে দিতেই কুমির কামড়ে ধরল বন্দুকের নল। তার গলায় আটকে যাওয়া বঁড়শি থেকে মোটা শনের দড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাবা দুম্ দুম্ করে দুটি গুলি দেগে দিলেন। কুমির আবার হাঁ করে বন্দুকের নল ছেড়ে দিয়ে মারাত্মক ভাবে জলে হুটোপাটি খেতে লাগল। কখনও কালো পিঠ কখনও সাদা পেট ক্ষণিকের জন্য দেখা যায়, আবার অদৃশ্য হয়ে যায় জলে। জল আস্তে আস্তে ফিকে লাল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে আবার গুলি ভরা হয়েছে বন্দুকে। সবাই মিলে দড়ি টেনে প্রায় নিস্তেজ দেহটা আবার ডাঙার কাছে নিয়ে এল। আবার দুটি দুম্ দুম্ আওয়াজ। কুমিরের ইহলীলা সাঙ্গ হল।

পুজোর কথায় ফিরি। প্রতিপদের দিন সন্ধ্যায় ঢুলি মহাদেবদা তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ঢোল বাজিয়ে আগমনী ঘোষণা করত। প্রথমটা সশব্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সবাইকে আহ্বান জানানো। তারপর চাপা চার মাত্রার বিভিন্ন ছন্দ বের করত কাঠির মাঝে হাত দিয়ে। আমার কাছে এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। প্রায় একই সময়ে রামপুরহাট থেকে আসতেন পুরোহিত রাখহরিদা। তিনি কাব্যতীর্থ ও স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ। থাকবেন সেই কালীপুজোর শেষ পর্যন্ত। এই এক মাস তিনি সারা দুপুর মাছ ধরতেন। পঞ্চমী থেকে শুরু হত আত্মীয়-পরিজনদের আগমন।

বাবা একটি সুন্দর কাজ করেছিলেন। শ্রীদুর্গার স্তব সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, যাতে সবাই তার মর্ম বোঝে। চোদ্দ-পনের বছর বয়সে সেই স্তব শুনে আমার মনে হত, এত চাওয়া কেন ? যশ দাও, ধন দাও ! সারাটা স্তব শুধু দাও আর দাও ! সাহস করে কাউকে সে-কথা বলতে পারতাম না। মনের প্রশ্ন মনেই থেকে যেত।

ছোটবেলার কথা মনে করতে গিয়ে বার বার পুজোর কথাই এসে পড়ছে, প্রক্ষিপ্ত স্মৃতির মধ্যে ধরা দিচ্ছে সেইসব আত্মীয়তা ও অভিজ্ঞতা, পুজোর সময় যা স্পষ্ট হয়ে উঠত। সম্ভবত এটা বাঙালি হওয়ার দুর্বলতা। তবে এই পুজোর অনুষঙ্গেই যে আমি অনেক কিছু চিনেছি, বুঝেছি, তা অস্বীকার করব কী করে। মানুষ বোধহয় সেইটুকুই রাখে যা থাকে।

পুজোতে বলিদান আমার জন্মের অনেক আগেই আমার বাবা আমার মায়ের অনুরোধে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শুনেছি এ জন্য তাঁকে অনেক গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল। বলিদানের কিছু স্মৃতি থেকে গিয়েছিল বাড়িতে। দেওয়ালে সারি সারি খাঁড়া ঝুলত। ছোট বড় কত আকারের খাঁড়া। কোনওটা মোষ বলির, কোনওটা পাঁঠা বলির। সবই অতীতের নৃশংসতার সাক্ষী।

পুজোর দিনগুলিতে সন্ধ্যা আরতির সময় মহাদেবদার ঢোলের সঙ্গে কাঁসি বাজাতাম আমি। আমার জন্য বহরমপুর থেকে একটা ছোট্ট কাঁসি আনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহাদেবদার কাছে তালিম নিতাম। তিন-চার বছরের মধ্যে ঢোলের কুড়-কুড়-কুড় রেলা কাঁসিতে বের করে দিতাম। বোল মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে ভাগলপুরে পড়বার সময় পুজোর ঠিক আরতির সময় দেশের বাড়িতে পৌঁছই। কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি কাঁসি বাজাতে শুরু করি। সেই শব্দ শুনে মা ভেতর-বাড়ি থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কাঁসি শুনেই বুঝেছি তুই এসে গেছিস !'

রাতে গানবাজনার আয়োজন হত। অনেক গাইয়ে বাজিয়ে আসতেন। মাঝে মাঝে আসতেন দাদাঠাকুরের সাগরেদ নলিনীকাকা (নলিনী সরকার)। শুধু মজার গান গাইতেন তিনি। আসরেই মায়ের নামে গান লিখে সঙ্গে সঙ্গে সুর দিয়ে গাইতেন। সে-গান শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ত সকলে। বহু বছর পণ্ডিচেরিতে বাস করে সম্প্রতি দেহ রেখেছেন নলিনীকাকা। 'দাদাঠাকুর' বইটি তাঁরই লেখা।

দেখতে দেখতে পার হয়ে যেত সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—ক্লান্তিবিহীন এই প্রতি বছরের আনন্দের খেলা। মানুষের জীবনে এত আনন্দও থাকে ! নিশ্চয়ই থাকে, প্রকাশের অপেক্ষায় পুজোর কটা দিনের জন্য সবারই এমন প্রতীক্ষা। বাবার বয়স বছর কুড়ি কমে যেত। মাকে এই সময়টার মতো এত হাসতে খুব কম দেখেছি। বিসর্জনের পর বিরাট শূন্যতা গ্রাস করত

বাড়িটাকে। সবাই আছে, সবকিছুই আছে, অথচ কিছুই যেন নেই । পূজা বেদির শূন্যতা বড় বেদনাদায়ক। সবার আড়ালে চোখ মুছতেন বাবা। ওই কান্না যেন জীবন সম্পর্কে কিছু বোঝাতে চাইত।

বাবা মারা যান ১৯৪৯ সালে। পুজো বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর আমার সঙ্গে দেশের কোনও যোগাযোগ ছিল না। পাঁচ-সাত বছর আগে আই. জি. স্বরূপ মুখার্জি একবার আমাকে ওই এলাকায় নিয়ে যান। গিয়ে দেখলাম কোথায় আমাদের সেই বাড়ি! সবই ধ্বংসস্তূপ। মিনিট পনের-কুড়ি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ল দুটো উইয়ে খাওয়া কাঠের টুকরো—মাঝখানে দুটো পেরেক দিয়ে আঁটা। বুঝলাম একটি চরকার ভাঙা টুকরো।

বাবা গান্ধীবাদী ছিলেন। পনের-বিশটা চরকা ছিল বাড়িতে। সারা দুপুর সবাই চরকা বুনত। আমার আর গীতার ছিল দুটো ছোট আকারের চরকা। সেই কাঠের টুকরোগুলি হাতে নিয়ে ভাবলাম, কে জানে, হয়তো বা আমার চরকারই ভগ্নাবশেষ!

২

১৯৩৩ সালে ভর্তি হলাম ভাগলপুরের দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলে, ক্লাস ফোরে। এম. ই. কথাটা এখন আর চলে না। এর মানে মিডল স্কুল, অর্থাৎ ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। ওই পর্যন্ত পড়া হলে বিহারের যত এম. ই. স্কুল ছিল, তার সবগুলিকে নিয়ে একটি ছোটখাটো ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার মতো পরীক্ষা হত। পাশ করলে হাইস্কুলে ঢুকবার ছাড়পত্র পাওয়া যেত।

দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুল তখন সম্পূর্ণভাবে বাঙালিদের স্কুল— প্রবাসী বাঙালিদের সম্মিলিত প্রয়াস, বাঙালিয়ানা বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। ডাক নাম 'বাংলা স্কুল'। হেড মাস্টারমশাইয়ের নাম সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; তিনি শরৎচন্দ্রের দূর সম্পর্কের মামা। সাদা শনের মতো আধা বাবরি চুল, ধবধবে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে সোনার পাঁসনে চশমা নীল সিল্কের সুতো থেকে ঝুলত গলায়। প্রয়োজন মাফিক এঁটে নিতেন চোখে। স্কুলের অন্যান্য মাস্টারমশাইরা, অবাক লাগে ভাবতে, বেশিরভাগই এসেছিলেন বাঁকুড়া জেলা থেকে। সুতরাং কথায় কথায় 'হবেক নাই' শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

হেড মাস্টারমশাইয়ের আর একটি ব্যাপার ছিল দেখবার মতো। তিনি বেহালা বাজাতেন। স্কুলে ক্লাস বসার আগে প্রতিদিন প্রার্থনাসভায় যে-গানটি গাওয়া হত, সেটিও ঠিক করে দিয়েছিলেন তিনিই—'জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' আমরা, ছাত্ররা, গাইতাম আর গানের সঙ্গে বেহালা বাজাতেন তিনি।

ইংরেজ আমলে ভাগলপুর বড় সুন্দর শহর ছিল। উত্তরে শহরের ৫০ ফুট নীচে দিয়ে গঙ্গা বয়ে যেত। লোকে বলত, দ্বিতীয় বেনারস। চৈত্রদিনে ঝরা পাতার সঙ্গে পশ্চিম থেকে লু বইতে শুরু করত। সেই বিকেল চারটে পর্যন্ত। তখন বাড়ির বাইরে থাকা দায়। গঙ্গার ওপারে বিশাল চর ঢাকা পড়ে যেত হলদে ধোঁয়াটে রঙের বালির ঝড়ে। সকালে কিন্তু এপার থেকে দেখা যেত সোনা দিয়ে মোড়া ওপারের বুকে অসংখ্য কালো কালো বিন্দু। ওই বিন্দুগুলি এক একটি বিশাল আকারের তরমুজ। ওজন ১৫ থেকে ২৫

সের। আট আনা দামের একটি তরমুজে একটি সংসারের দুপুরের খাওয়া হয়ে যেত।

বর্ষায় ভরা গঙ্গার চেহারা ভয়াবহ। একাকার হয়ে যেত এপার-ওপার। প্রায়ই মানুষ ডুবে যাওয়ার খবর আসত। গরমকালে স্কুল-কলেজ হত সকালে।

শীতে হিমালয় থেকে আসা বাধা-বন্ধ-হারা হাড়-কাঁপানো হাওয়া বেশ কাবু করে ফেলত আমাদের। তবে ওই শীতেও ভোরবেলায় সূর্য ওঠার আগে বেশ কিছু স্নানার্থী ঘাটের দিকে যেতেন স্নান করতে। মাঝে মাঝে হঠাৎ পাঁচ-ছ'টি শিশুকণ্ঠের গানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত। সঙ্গে বেহালার সঙ্গত। সেই একই গান : 'জীবনে যত পূজা হল না সারা...।'

হেড মাস্টারমশাই স্বপ্ন দেখতেন দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলকে একদিন তিনি এইচ. ই. স্কুল করবেন। হাই স্কুল আর কি! তাই ক্লাস ওয়ান-টু-এর ছেলেদের নিয়ে প্রভাতী গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতেন।

কালক্রমে সফল হয়েছিল তাঁর স্বপ্ন। আমাদের আগের ব্যাচের সময়ে ক্লাস এইট, ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস ইলেভেন পর্যন্ত হল। তৈরি হল নতুন বাড়ি— লালা লাজপত রায় পার্কের পূর্ব দিকে।

১৯৩৯ সালে দুর্গাচরণ হাই ইংলিশ স্কুল থেকে পরীক্ষা দিল প্রথম ব্যাচের গোটা কুড়ি ছাত্র। আমাদের বাংলা স্কুলের পুরনো বিল্ডিং-এর পাশেই বিরাট খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল— সংক্ষেপে : সি. এম. এস.। বিরাট তার পরিধি— ফুটবল মাঠ, ক্রিকেট মাঠ, অ্যাসেমব্লি হলের চূড়ায় বড় আকারের ঘড়িটা দেখা যেত বহু দূর থেকে। সি.এম.এস.-এর প্রিন্সিপাল ছিলেন মিস্টার হার্ডফোর্ড। বাঙালি সমাজে এক অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। মিষ্টভাষী ও উদার। ছাত্রদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতেন। খেলার সময় অত্যন্ত সিরিয়াস। কেউ ক্রশ-ব্যাটে খেললে রেগে যেতেন ভীষণ। সোজা ব্যাট কী করে ধরতে হয়, ব্যাট চালাবার আগে পায়ের পজিসন কেমন হবে— খুব যত্নের সঙ্গে শেখাতেন এসব। স্কুলের কাজের পর সারা শহর চক্কর মারতেন সাইকেল চড়ে।

১৯৪১ সালে হঠাৎ একটি ঝোড়ো হাওয়া খবর দিয়ে গেল— রবীন্দ্রনাথ নেই। খবর শুনে সমস্ত বাঙালি সমাজ নির্বাক। আমি তখন বড় হয়েছি, কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবরে কেমন শোক-মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল আমাদের ছোট শহর। ঠিক একই রকম দেখেছিলাম ১৯৪৮ সালে গান্ধীজি হত্যার সন্ধ্যায়। আমি তখন কলকাতায়। ট্রামে বাসে কেউ কথা বলছে না। চৌরঙ্গি থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত হেঁটেছিলাম। পথে অগণিত জনতা, কিন্তু সকলেই স্তব্ধ। আশপাশে শুধু গাড়ি চলার আওয়াজ। মনে

হয়েছিল, এক মূক-বধির মহানগর দিয়ে হেঁটে চলেছি।

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সি. এম. স্কুলের অ্যাসেমব্লি হলে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র শোকসভা। শহরের এবং কলেজের বিদগ্ধ, গুণী, অধ্যাপকরা বক্তৃতা দিলেন ইংরেজিতে। শব্দ চয়ন, অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে শেলি, কিট্‌স, কালিদাস, টেনিসন, ব্রাউনিং, এলিয়ট, ইয়েটস্ প্রভৃতিকে টেনে নিয়ে এসে যেন কথার শ্রদ্ধাঞ্জলি শুরু হল জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে। দুঃখ এই, বক্তৃতায় চাপা পড়ে গেল রবীন্দ্র-বিয়োগ বেদনা। সবশেষে বলতে উঠলেন মিঃ হার্ডফোর্ড। নিমীলিত চোখে বাংলায় 'হে বন্ধু বিদায়' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন শুধু। অজান্তে জল এসেছিল চোখে। আমি সারা জীবনে কোনও ভারতবাসীকে এইভাবে গভীর সংযম এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে শোক প্রকাশ করতে দেখিনি।

আমাদের বাংলা স্কুলের বাঁকুড়া জেলার মাস্টারমশাইরা ছিলেন মজার মানুষ। অহিবাবু স্যার কথায় কথায় পেটাতেন ছাত্রদের। তিনি পড়াতেন ক্লাস ফোর পর্যন্ত। কিন্তু এই শিশুদেরও ঠেঙাতে ছাড়তেন না। বিধুবাবু স্যার অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। কিন্তু, রেগে গেলে খারাপ কথা বলতেন। অঙ্কে ভুল করলে বলতেন, ওই খ্রিস্টানদের স্কুলে ভর্তি হোগে যা— এখানে কিচ্ছু হবে না। কেষ্টবাবু স্যার টিফিনের সময় ছাত্রদের সঙ্গে গুলি খেলতেন মাঝে মধ্যে। দ্বিজেনবাবু স্যার চক্ দিয়ে গাঁট্টা মারতেন। কিন্তু, কোথায় যেন মনে হত, এ সব ছাপিয়ে এক অকৃত্রিম স্নেহ বেরিয়ে আসত তাঁদের হৃদয় থেকে।

একবার এক ম্যাজিসিয়ান ম্যাজিক দেখাতে এলেন স্কুলে। নানা রকম ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন আমাদের। কিন্তু তাঁর শেষ ম্যাজিকটি ছিল বড় মর্মান্তিক। আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে কালো কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিলে শোয়ানো হল। তারপর তার মুখের উপরে হাত নেড়ে নেড়ে 'হিপনোটাইজ' করে বললেন, সাময়িকভাবে এর নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিলাম। দেখলাম, সে-কথা শুনে বিধুবাবু স্যার খুবই উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত। জল চিকচিক করছে চোখে। এরপর ম্যাজিসিয়ান আদেশ করলেন, 'ওঠো'। আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, ছেলেটির নিথর শরীর আস্তে আস্তে ভেসে উঠতে লাগল শূন্যে। ম্যাজিসিয়ান আদেশ করলেন, 'দাঁড়াও'। তখন শূন্যে থেমে গেল ওই দেহ। ম্যাজিসিয়ান তারপর ছেলেটিকে আবার টেবিলে নামিয়ে এনে জ্ঞান ফিরিয়ে দিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফোকলা দাঁতে হাসতে লাগলেন বিধুবাবু স্যার।

একবার কলকাতা থেকে এক সরোদ বাজিয়ে এলেন স্কুলে। বেলা দুটোয় ছুটি হয়ে গেল। সবই হেড মাস্টারমশাইয়ের প্রচেষ্টা। পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে, তিনি চাইতেন ছাত্ররা শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের পোকা না

হয়ে এই পৃথিবীর যত আনন্দ তা গ্রহণ করতে শিখুক। ভদ্রলোক সরোদ বাজালেন। শুনলাম, তিনি নাকি 'চণ্ডীদাস' ছবিতে সরোদে কীর্তন বাজিয়েছিলেন। তাঁর বাজনা শুনে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম আমরা। কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল স্বপ্নের জগতে আছি।

প্রতি শনিবার হাতে একগাদা বাঁশের বাঁশি নিয়ে নরেশবাবু আসতেন বাঁশি শেখাতে। আমরা অনেকেই শিখতাম। দশ বারো বছর বয়সে যতটা শেখা যায়। ভৈরবী, কাফি, ভীমপলশ্রী, দেশ ইত্যাদি সহজ রাগ। এক কথায় রাগ-রাগিণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া আর কি!

কলকাতার নগেন দে আর খগেন দে দুই ভাই। একজন বাজাতেন বাঁশি, অন্যজন ম্যাণ্ডোলিন। হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানি তাঁদের রেকর্ড বের করল। একপিঠে পিলু, অন্য পিঠে ভাটিয়ালি। খুব চলেছিল বাজারে। আমরা ওই রেকর্ড শুনে বাঁশিতে তুলতাম। সাহায্য করতেন বিনুদা স্যার—আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই। বিনুদা তখন তরুণ, সবে বি.এস সি. পাশ করে এসেছেন আমাদের স্কুলে। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতেন, বাঁশি-তবলা বাজাতেন, আবার ক্রিকেটেও অক্লান্তভাবে বোলিং করতেন আমাদের আর আমরা ব্যাট চালিয়ে হাঁকড়াতাম। একদিন এরিথমেটিক ক্লাসে ঢুকে বললেন, 'রোজ রোজ অঙ্ক যেমন তোমাদের ভাল লাগে না, তেমনি আমারও ভাল লাগে না। আজ একটা গল্পের বই পড়া যাক।' টুলটা সামনে টেনে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন বিনুদা স্যার, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'। যথাসময়ে ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল; 'শ্রীকান্ত' পড়া কিন্তু শেষ হল না। বললেন, 'বাকিটা দুদিনে শেষ করে দেবো।' আমার কৈশোরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এইভাবে, বিনুদা স্যারের কণ্ঠ-মাধ্যমে।

বাঁকুড়া জেলার মাস্টারমশাইরা খেলাধূলা পছন্দ করতেন না। অহিবাবু স্যার তো এ ব্যাপারে যম। তাঁর হেফাজতে থাকত ক্রিকেটের সরঞ্জাম। শীতের শনিবারের দুপুরে ব্যাট-বল চাইতে গেলে দিতেন না। বলতেন, 'দুপুর বেলায় খেলা! লেখাপড়ার সময় খেলা হবেক নাই।' ভয়ে ভয়ে বলতাম, 'ক্রিকেট তো দুপুর বেলাতেই খেলা হয় স্যার!' উত্তর একটিই, 'যা, ওই খ্রিস্টানদের স্কুলে পড়গে যা। যত্ত মন চায় খেল্লিস, এখানে হবেক নাই।' বিনুদা স্যার আসার পর অহিবাবুর দাপট কমল।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় বিনুদা আমাকে বাড়িতে পড়াতেন। আগেই বলে দিয়েছিলেন, 'ম্যাথমেটিক্সে তুই ৭০-এর বেশি পাবি না। এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বেরিয়ে আসবি, কেয়ারলেস মিস্‌টেকের জন্যে ২০/৩০ নম্বর কাটা যাবে।' পরীক্ষায় ওই ধরনেরই কিছু একটা হয়েছিল। একজন সংস্কৃতের পণ্ডিতও আমাকে বাড়িতে পড়াতেন। মাইনে ছিল মাসে

চার টাকা। তিনি বিহারি। আমাকে 'আপনি' বলতেন। তাঁর সম্বোধন শুনে বড় লজ্জা হত।

পপেনবার্গ নামে এক জার্মান একটি ছোট্ট মোটরচালিত ক্যাম্বিসের হাল্কা নৌকা করে ভারতবর্ষের সমস্ত নদী, উপনদী ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভাগলপুরের গঙ্গায় এসে নোঙর ফেললেন। হেড মাস্টারমশাই তাঁকে নিয়ে এলেন আমাদের স্কুলে। বললেন, 'তুমি আমার ছেলেদের তোমার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলো। ওরা পৃথিবীটাকে চিনুক।' পপেনবার্গ শুরু করলেন ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে, 'S' কে 'Z' উচ্চারণ করে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে দেখছিলাম আমরা। কটা চুল, কটা দাড়ি, গভীর নীল চোখ, গায়ের তামাটে রঙ—দেখেই মনে হল শরীরে যত শক্তি, মনে তত জোর। পপেনবার্গ গল্প বলতে বলতে হেড মাস্টারমশাইকে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিতেই তিনি বললেন, 'আমি আমার ছেলেদের সামনে সিগারেট খাই না।' পরে শুনেছিলাম, পপেনবার্গ ছিলেন জার্মান স্পাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতেই ভারতবর্ষের কোথাও গ্রেফতার করা হয় তাকে। বাকি ইতিহাস জানা নেই।

একদিন টিফিনের সময় বিধুবাবু স্যার ক্লাস ওয়ানের দুটি ছেলেকে কান ধরে আমাদের সামনে নিয়ে এসে বললেন, 'এ দুটো সু-সু করতে করতে বলছিল, আয় আমরা সু-সুতে সু-সুতে ঘুড়ির প্যাঁচ লড়ি।' বলেই ছেলে দুটির পিঠে মৃদু কিল মেরে হাসতে লাগলেন ফোকলা দাঁতে। আমরাও হেসে উঠলাম।

ভূপতিবাবু স্যারের পায়ে ছিল একজিমা। থেকে থেকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চোখ বন্ধ করে পা চুলকোতেন। পড়াতেন ভূগোল। সেই সময় কেউ যদি এই বিরাট গ্রহের কোথাও কোনও দেশের রাজধানী বা পর্বতমালা বা বনানীর নাম ভুল করত, তা হলে শাস্তি একটিই— দুটি আঙুলের মাঝে পেনসিল দিয়ে আবার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে টিপে ধরতেন।

জটাধারী পণ্ডিতমশাই বীরভূমের লোক। পড়াতেন বাংলা ব্যাকরণ, সেই সঙ্গে রচনা। কত কী যে রচনার বিষয় থাকত ভাবা যায় না। তখন গরু, ঘোড়া বিষয়ে রচনা লেখার বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। একটি শব্দ সবে তখন ভারতবর্ষে কখনও সখনও শোনা যায়— কম্যুনিজম্। পণ্ডিতমশাই একদিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কম্যুনিজম্ রাশিয়া শাসন করছে, এ কথার মানে কী?' আমি কিছুই জানি না, তো কী উত্তর দেবো। চুপ করে থাকলাম। এক সহপাঠী সাহস করে বলল, 'স্যার, কম্যুনিজম্ মানে সবাই স্বাধীন, কোনও কিছুতেই বাধা নেই। বিয়ে করারও প্রয়োজন নেই, যে যার সঙ্গে থাকতে পারে—', এইরকম কিছু কথা। বলা বাহুল্য, তাকে ক্লাস থেকে বের করে দিলেন পণ্ডিতমশাই। পরে সেই বন্ধুকে বললাম, 'তুই

এসব জানলি কী করে ?' সে বলল, 'আমার মামা গত মাসে লন্ডন থেকে ফিরেছে, মামাই কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে এসব বলেছে।' লন্ডনে যাওয়া তখন বিরাট ব্যাপার। মামা লন্ডনে গেছে শুনে ভাগ্নের উপরেও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল্। জিজ্ঞেস করলাম, 'লন্ডনে কি পড়তে গিয়েছিলেন ?' সে বলল, 'লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ ভর্তি হয়েছে।' শুনে শ্রদ্ধা আরও এক ধাপ বাড়ল। সেই প্রথম কম্যুনিজম্ শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয়। সময়টা যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩৬ সাল।

পণ্ডিতমশাইয়ের ছেলে কদমদা, আমাদেরই স্কুলে এলেন অহিবাবু স্যারের বদলে। অহিবাবু দেশে ফিরে গিয়েছেন বহু কাল একা প্রবাসে থাকার পর।

কদমদা ছিলেন দক্ষ সাঁতারু। নিমেষে তাঁর চেলা হয়ে সাঁতারে মন দিলাম। এক বছরের মধ্যে সাঁতরে গঙ্গা পার হতে শুরু করলাম। প্রথমবার সাঁতরে গঙ্গা পার হওয়ার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হয়েছিল, আমি যেন পপেনবার্গ হয়ে গিয়েছি। কদমদার মৃত্যু হয় অকালে, আমি তখন কলকাতায়। বড় কষ্ট হয়েছিল।

গান্ধীজি এলেন ভাগলপুরে। সেটা খুব সম্ভবত ১৯৩৬/৩৭ সাল। লালা লাজপত রায় পার্কে সভার আয়োজন হল। বিশাল অশান্ত জনতা, সকলেই চায় গান্ধীজির কাছে যেতে। ব্রিটিশরাজ পুলিশের ব্যবস্থা করেনি। সুতরাং চরম বিশৃঙ্খলা। মাঝে মাঝে আওয়াজ আসছে 'হাল্লা শান্তি, হাল্লা শান্তি'। কোথায় শান্তি ! আমরা, ভারতবাসীরা, চিরকালই আবেগপ্রবণ ও অশান্ত, নিয়মানুবর্তিতার ধার ধারি না। ফলে ধস্তাধস্তি। আমি পড়ে গেলাম সেই ভিড়ের মধ্যে। পাঁজরার দু-তিনটি হাড় ভাঙল। অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে বাড়িতে আনা হয়েছিল। তখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ি। ওই যে তিন সপ্তাহ বাড়িতে শুয়ে ছিলাম, এর প্রতিদিনই একজন না একজন মাস্টারমশাই বাড়িতে আসতেন। এই সময় হঠাৎ একদিন আমার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। তিন মাস পরে সুস্থ হয়ে ভাগলপুরে ফিরলাম। অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে তখন। শুনলাম, পরীক্ষা না দিয়েই পাশ করেছি। অথচ ছাত্র হিসাবে এমন কিছু ভাল ছিলাম না। ডাক্তাররা বাঁচালেন, মাস্টারমশাইরাও বাঁচালেন।

কলকাতায় যেমন গড়ের মাঠ বা ময়দান, ভাগলপুরে তেমনই স্যান্ডিস কম্পাউন্ড, শহরের পূর্ব দিকে বিরাট একটি মাঠ। মাঝখান দিয়ে সিঁথির মতো পথ, তার দুধারে ঝাউ গাছ। গোটা দশেক ফুটবল মাঠ ঢুকে যেত। সেই সঙ্গে বিরাট মসৃণ সবুজে ঢাকা পোলো খেলার মাঠ। স্যান্ডিস কম্পাউন্ডের দিকে একটু গভীর ভাবে তাকালেই পাওয়া যেত ঋতুর বিবর্তনের আভাস। শীতে নিঃস্ব, রিক্ত, অনাবৃত। মার্চ মাস থেকে হলদে গুলমোহরের সমারোহ। গ্রীষ্মে, বুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে অনাবিল জ্যোৎস্না।

বর্ষায় ঢালু গড়িয়ে অজস্র ধারায় জল নামা। ঋতুর পরিবর্তনগুলি যেন চড়া সুরে বাঁধা। তাই আমাদের চরিত্রে কোমলতার একটু অভাব ছিল। কাঠখোট্টা গোছের আর কি!

ভাগলপুর ফুটবল ক্লাব, সংক্ষেপে বি.এফ.সি.-তে খেলতাম আমরা। বাঙালিদের নিজস্ব একটি টিমও ছিল, নাম 'মিলনী'। কর্মকর্তাদের কারও সঙ্গে কারও মিল ছিল না, অথচ ক্লাবের নাম যে কী করে মিলনী হল তা আজও বুঝি না!

বাঙালি পাড়া বাঙালিটোলায় ঢুকলে মনে হত বালি কি উত্তরপাড়ায় আছি। বি.এফ.সি. কিন্তু বিহারের নাম করা ক্লাব ছিল। আমরা খেলতে যেতাম অনেক দূরে দূরে।

মিঃ ওয়েবস্টার আই. সি. এস. তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সেই সঙ্গে অক্সফোর্ডের ব্লু। তিনিও খেলতেন আমাদের সঙ্গে। ব্যাক থেকে অত্যন্ত সুন্দর খেলতেন, খেলা শেখাতেনও। কিন্তু তাঁর স্বভাবে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। খেলার সময় এত মেলামেশা, এত উপদেশ, এত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার, কিন্তু পথে-ঘাটে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন, চিনতেই পারতেন না। তখন বড় অসম্মানিত বোধ করতাম। তখনই মনে একটা জেদ চেপে গেল, জীবনে কোনও ইংরেজের সঙ্গে যেচে কথা বলব না। প্রথম যৌবনে বেশ কিছুদিন লন্ডনে বাস করার সুযোগ হয়েছিল, তখনও সেই জেদ বজায় রেখেছিলাম। তবে পরবর্তীকালে সিনেমার কল্যাণে অসংখ্যবার বিদেশে গিয়েছি, নিজের অজান্তে বন্ধুত্ব হয়েছে বহু ইংরেজের সঙ্গে, তাঁদের সহৃদয়তার পরিচয়ও পেয়েছি। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণের সেই জেদ ততদিনে কোথায় ভেসে গিয়েছে!

সুভাষচন্দ্র একবার এলেন ভাগলপুরে। সাল তারিখ মনে নেই। ক্লাস নাইন-টেনে পড়ি। বিশাল জনতা। পুলিশবাহিনীও বিশাল। তখন সুভাষচন্দ্র মানেই পুলিশের সতর্কতা। চোস্ত উর্দুতে টানা এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। সমস্ত শহর সেদিন কেঁপে উঠেছিল, যখন বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'ব্রিটিশদের তিনবার অনুরোধ করব, তোমরা নিজের দেশে ফিরে যাও। না শুনলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।' ঝলমলে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বড় সুন্দর, বড় তেজস্বী দেখাচ্ছিল তাঁকে। এখনও তাঁর কথা ভাবলে আমি সেই চেহারা দেখতে পাই, স্পষ্ট শুনতে পাই সেই কণ্ঠস্বর।

সাহিত্যিক বনফুল তখন ভাগলপুরে। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতিখানা লুঙ্গি করে পরে লাঠি হাতে যেতেন নিজের ল্যাবরেটরিতে। পথে দেখলে বেশ ভয় পেতাম। কথা বলতেন না বিশেষ কারও সঙ্গে। ভাগলপুর স্টেশনের হুইলার স্টলে নিয়মিত সকালে হাজিরা দিতেন তিনি। সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই পড়তেন। আমি চিত্র পরিচালক হওয়ার পর ইচ্ছা

হয়েছিল তাঁর ছোটগল্প 'অর্জুন পণ্ডিত' অবলম্বনে 'আরোহী' নাম দিয়ে একটি ছবি করব। কিন্তু তখনও ছেলেবেলার সেই ভয় যায়নি। ইতিমধ্যে তাঁর অধিকাংশ বই-ই আমার পড়া হয়ে গিয়েছে ; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা যেমন বেড়েছে তেমনই ভয়ও বেড়েছে অনেক। 'জয় মা' বলে একটা পোস্টকার্ড ছাড়লাম ভাগলপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছি বলে। দু' একদিনের মধ্যেই উত্তর এল। তিনি নিজেই কলকাতা আসছেন কী একটা কাজে—সুতরাং সময় নষ্ট করে আমার ভাগলপুরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একটি বাড়িতে দেখা করতে লিখলেন।

নির্দিষ্ট দিনে ভয়ে ভয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রথমেই বললেন, 'ভাগলপুর থেকে তোমার জন্যে জর্দালু আম এনেছি। আগে খাও, তারপর কথা হবে।' সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল নিমেষে। আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। সিনেমা-রাইটের জন্য কী দক্ষিণা দিতে হবে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'যা খুশি দিও।'

'আরোহী' ছবি দেখে বম্বের এক প্রযোজক সেটা করতে চাইলেন হিন্দিতে। আমার কাছে এসে রাইট কিনতে চাইলে একটা চিঠি দিয়ে বনফুলের কাছে পাঠিয়ে দিই। বাংলায় ছোট্ট করে একটা মোটা টাকার অঙ্ক লিখে দিয়েছিলাম। পরে শুনলাম, সেই টাকাতেই হিন্দির প্রযোজক রাইট কিনেছিলেন।

স্কুলে জ্যামিতি পড়াতেন দ্বিজেনবাবু। তাঁর টাইফয়েড হল। তাঁর বদলে ক্লাস নিতে এলেন হেড মাস্টারমশাই। অবাক হয়ে দেখলাম হাতে 'চয়নিকা'। ভূমিকা না করে শুরু করলেন : 'ভূতের মতন চেহারা যেমন...।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য'। এইভাবে টানা দু'মাস প্রতিদিন জ্যামিতির ক্লাসে পড়া হল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। 'পুরাতন ভৃত্য' থেকে আমরা তখন 'উর্বশী'-তে প্রমোশন পেয়ে গেছি। পরীক্ষার দু' সপ্তাহ আগে বললেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যে এক থেকে ষোলোর থিয়োরেম করে আনবে, করোলারি সুদ্ধু। আমি জানি আমার ছেলেরা ভাল, কোনওরকম অসুবিধা হবে না।' তাঁর হাতেই আমাদের প্রথম রবীন্দ্রবর্ণপরিচয়।

উত্তরপ্রদেশ থেকে হাজার হাজার বাঁশ বেশ শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে কলকাতায় আনা হত। প্রায়ই দেখতাম, গঙ্গার ঘাটে অনেকটা জায়গা নিয়ে একপাশে কিছু দিনের জন্য পড়ে থাকত বাঁশগুলি, তারপর আবার রওনা হত কলকাতার দিকে। সেই সময় একটু সাবধানে সাঁতার কাটতে হত। কারণ চোরা স্রোত বাঁশের তলায় ঠেলে দিলে বের হওয়া মুশকিল ছিল। আমাদের স্কুলের একটি নিচু ক্লাসের ছেলে এইভাবে ডুবে যায়, পরে তার দেহ উদ্ধার করা হয় দড়ি-বাঁধা বাঁশের তলা থেকে। পরদিন স্কুলে নিয়মিত প্রার্থনার সময় আমরা সমবেত কণ্ঠে যখন গাইছি : 'যে ফুল না

ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে/যে নদী মরুপথে হারালো ধারা—', দেখি হেড মাস্টারমশাই চোখ বন্ধ করে বেহালা বাজিয়ে চলেছেন। আর তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। কতদিন হয়ে গেল, কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে সেই দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখে।

ইহুদি কোহেন সাহেবের অনেক সম্পত্তি ছিল ভাগলপুরে। বিরাট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা তাঁর আমবাগান। সেখানে ল্যাংড়া, বোম্বাই, জর্দালু ইত্যাদি ভাল জাতের আমের গাছ। টাকা ধার দেওয়ারও কারবার ছিল তাঁর। আর ছিল তিনটি অতি সুন্দরী মেয়ে—সেরা, ডোরা আর ফ্লোরা।

কোহেন সাহেব মাথায় জু-টুপি, হাতকাটা পাঞ্জাবি আর থ্রি-কোয়ার্টার পাজামা পরে তিন কন্যাকে নিয়ে স্যান্ডিস্ কম্পাউন্ডে বেড়াতে যেতেন রোজ। ওদের দেখে আমাদের রক্তে চঞ্চলতা, নাড়ির স্পন্দন বেড়ে যেত। তিনটির মধ্যে কোনটি বেশি সুন্দরী, তা নিয়ে তর্ক বেধে যেত বন্ধুদের মধ্যে। নারায়ণের পছন্দ ছিল বড়টিকে; আমার পছন্দ মধ্যমা ডোরা, অংশীদার নরেন। বিকাশেন্দুর আবার তিনজনকেই ভাল লাগত। বিকাশেন্দু প্রতিভাবান ছাত্র, ইউনিভার্সিটিতে বরাবর স্ট্যান্ড করে এসেছে। ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম স্থান অধিকার করে। পরবর্তীকালে দেখেছি, পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকেই তার ভাল লাগত এবং তা প্রকাশও করত নিঃসঙ্কোচে।

ডোরার টিকালো নাক, আয়ত চোখ, কোনও রকম মেক-আপ নেই—সত্যিই অত্যন্ত সুন্দরী। সেই বয়সের উন্মাদনায় ওর ঘন কালো চোখের তারায় হারিয়ে গেলাম আমি। খুব পরিচয় করতে ইচ্ছা হত, কিন্তু সাহস ছিল না।

আমাদের পাড়াতেই থাকত হাজারি, একটি বিহারি ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ। ইংরেজ আমলে কোনও বিহারি ছেলে কোনও রকমে ম্যাট্রিক পাশ করলে পুলিশের কাজ বাঁধা। হাজারিও পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর হল। তার আগেই, অর্থাৎ স্কুলে পড়তেই, ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে বিহারি সমাজে ছোটবেলাতেই বিয়ে হয়ে যেত। আমরা যখন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে তখন আমার বেশ কয়েকজন বিহারি বন্ধুর শুধু বিয়েই নয়, দু' একটি কাচ্চাবাচ্চাও হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ একদিন দেখি, হাজারি কোহেন সাহেবের তিন কন্যাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব রাগ হল। এমনকি ধরে ঠ্যাঙাতে ইচ্ছা হল। কিন্তু হাজারি যে ব্রিটিশ-পুলিশ—কী করে পেরে উঠব ওর সঙ্গে! এরপর একদিন শুনলাম, কেলে-কুচ্ছিত হাজারি নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে ডোরাকে বিয়ে করেছে।

বাংলা স্কুলে যখন ভর্তি হই তখন আমার বয়স নয় বছর। একটু বেশি

বয়সেই স্কুলে গিয়েছিলাম। তার আগে বাড়িতে একজন মাস্টারমশাই আমাকে আর আমার ছোট বোন গীতাকে পড়াতেন। তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। যাকে বলে গৃহশিক্ষক। যেমন কঠোর ছিল তাঁর শাসন, তেমনই নিয়মানুবর্তিতা। ভোর পাঁচটায় উঠে তৈরি হয়ে ঠিক ছ'টার সময় পড়তে বসতে হত। সকাল সাতটায় জলখাবারের ছুটি, মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য। আবার সাড়ে সাতটা থেকে দশটা। গীতার ছুটি হত নটায়, কারণ তার গানের মাস্টার আসতেন। পাশের ঘরে গান-বাজনা চলছে, আর আমাকে অঙ্ক কষতে হচ্ছে—একটুও ভাল লাগত না। অঙ্ক কষতে কষতে গান তুলে ফেলতাম। বেলা একটা থেকে চারটে আবার পড়া। চারটের সময়ও একা বেড়াতে যাওয়ার অধিকার ছিল না। সঙ্গে মাস্টারমশাইও থাকতেন। সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত আটটা অবধি আবার বইয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। মাস্টারমশাইয়ের উপর মা-বাবা কোনওদিন কথা বলতেন না। এক কথায়, তাঁর হাতেই সঁপে দেওয়া হয়েছিল আমাকে। এই জেলখানার জীবন থেকে যেদিন স্কুলে গেলাম, সেদিন পেলাম এক অনাস্বাদিত মুক্তির স্বাদ। মাস্টারমশাইয়ের উপরে আরও বিরক্ত হতাম, কারণ তিনি বেয়াড়া ধরনের ভুল সুরে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন।

স্কুলে ইতিহাস এবং ইংরেজি পড়াতেন গুরুদাসবাবু। বড় সুন্দর তাঁর পড়ানোর ধরন। নতুন এসেই মন জয় করে নিলেন আমাদের। একদিন ফরাসি বিপ্লব পড়াতে পড়াতে চলে এল চার্লস ডিকেন্স-এর 'এ টেল অব টু সিটিজ'-এর প্রসঙ্গ। কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাগলপুরের এক সিনেমা হলে 'এ টেল অব টু সিটিজ' ছবিটি এসেছে। পাঠ্য ইতিহাস ছেড়ে 'এ টেল অব টু সিটিজ'-ই পড়াতে লাগলেন গুরুদাসবাবু। দিন দুয়েক পরে বললেন, 'যাও, এবার ছবিটা দেখে এসো সকলে।'

গেলাম। ছবির শুরুতেই 'ইট ওয়াজ দি বেস্ট অব টাইমস্—ইট ওয়াজ দি ওয়ার্স্ট অব টাইমস্' ইত্যাদি ক্যাপশন পড়ে গুরুদাসবাবুর অসাধারণ পড়ানোর কথা মনে পড়ছিল। সিডনি কার্টন-রূপী রোলান্ড কলম্যান যেন মিলে গিয়েছিলেন গুরুদাসবাবুর কল্পনার সঙ্গে। ওই ছবি এবং উপন্যাস স্কুল জীবনে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় আমার মনে। যেন অবচেতনে সৃষ্টি হল এক নতুন জগৎ। পরবর্তী কালে আমার চিত্র পরিচালক হওয়ার মূলে ডিকেন্স-এর ওই অনবদ্য উপন্যাস এবং ওই সিনেমার অবদান নিশ্চয়ই ছিল।

মনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ভাগলপুরের এক নাম-করা উকিল। সম্পর্কে আমার জামাইবাবু। ধীর, স্থির, স্বল্পভাষী, বিচক্ষণ মানুষ। কেউ কেস নিয়ে এলে চেষ্টা করতেন যাতে দু'পক্ষ নিজেরাই মিটমাট করে নেয়। কোর্টে যাওয়ার পরিণাম যে শুভ নয়, তা বোঝাতেন। প্রচণ্ড গান্ধীভক্ত। সম্পর্ক

ছিল সবরমতী আশ্রমের সঙ্গে। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে একবার পুলিশে খুব মারধোর করে বাঁকা-তে। জামাইবাবু তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে নিরলস সেবা করেন। খদ্দরের চাপকান পরে কোর্টে যেতেন তিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ-ছ' বছর পর হঠাৎ খদ্দর ছেড়ে দিলেন। পাটনার 'সার্চ লাইট' কাগজে নিয়মিত লিখতেন, বন্ধ করে দিলেন সেটাও। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা বিরাট কাজ করেছিলেন। সুদীর্ঘ ৫০ বছর ধরে ওকালতি করার সময় প্রায় সাত-আট হাজার গরিব ছেলেকে পড়াশুনোর খরচ জুগিয়ে ম্যাট্রিকটুকু পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন—কেউ কোনও দিন কিছু জানতে পারেনি। নিঃশব্দে সবকিছু করাই ছিল তাঁর স্বভাব। ব্রিটিশ সরকার বড় চাকরি দিতে চেয়েছিল, যদি উনি কংগ্রেস ছাড়েন এই শর্তে। নেননি।

সাত-আট জনের একটি ছোট্ট দল ছিল আমাদের। অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল। এর বাইরে বিশেষ কাউকে পাত্তা দিতাম না। ভাগলপুরে নিয়মিত থিয়েটার-যাত্রা হত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত পূর্ণিমা-সম্মেলনে। আমরা কিছুর মধ্যেই থাকতাম না। শুধু নির্জলা আড্ডা। রুবি টি স্টোর্স-এর সামনে তিন-চারটি বেঞ্চি পাতা থাকত। সেখানেই আড্ডা হত সন্ধ্যায়। বয়স্করা বলতে শুরু করলেন, এরা উচ্ছন্নে গিয়েছে। বড় অভিমান হল। ঠিক করলাম, প্রকাশ্যে আর আড্ডা মারব না। তখন রুবি টি স্টোর্সের উল্টো দিকে মাসে তিন টাকা দিয়ে একটি ঘর ভাড়া করলাম। বিকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা অবধি শতরঞ্জি পেতে আড্ডা হত। আমাদের এই দলের দু'জন পাটনা ইউনিভার্সিটিতে ম্যাট্রিক এবং ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষায় যথাক্রমে চতুর্থ এবং পঞ্চম এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। বাকিরা কেউ ডাক্তার, কেউ অধ্যাপক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার—প্রত্যেকেই সুপ্রতিষ্ঠা পায় নিজের নিজের ক্ষেত্রে। আমাদের সেই দলের মাত্র তিনজন এখনও বেঁচে আছি। আর সবাই চলে গিয়েছেন।

রুবি টি স্টোর্সের মালিক ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। স্বেচ্ছায় এসেছিলেন ভাগলপুরে। তখন বাংলা ভাষায় 'উদ্বাস্তু' বলে কোনও কথা যে আছে, তা জানতাম না। যেমন এখনকার 'অপসংস্কৃতি' কথাটাও তখন শুনিনি। রুবি-তে চা খেলে নগদ পয়সার বদলে একটি চিট দিতাম, এক কাপ চা, তলায় কায়দা করে একটি সই। মাসান্তে বিল হত দেড় থেকে দু'টাকা। কিন্তু সেই রুবি-টি-বাবুর দেনা জীবনে শোধ করতে পারিনি। টাকা দিতাম ঠিকই, কিন্তু তার বদলে চিটগুলি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেব, সেই বুদ্ধি আর ধৈর্য ছিল না। পরিণামে বিলগুলি বার বার ধরিয়ে দিতেন। চিটে তারিখ লেখারও বালাই ছিল না। বুঝতাম ঠকাচ্ছেন। কিন্তু ঠকতে আর কার ভাল লাগে! ভাগলপুর ছাড়ার আগে, দু'তিন মাস, খুব চা খেলাম—কিন্তু বিল

দিইনি। আসার সময় বললাম, 'কলকাতায় এসে টাকা নিয়ে যাবেন।' অনেক দিন পর কলকাতায় এসেছিলেন। সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। সর্বাঙ্গে চরম দারিদ্র্যের চিহ্ন। ছোটবেলার মানুষ বড়বেলায় পৌঁছে কেমন বদলে যায়!

একবার জ্যোৎস্নারাতে 'শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ' খেলার বাসনা হল। ঠিক করলাম, রাতে একটি নৌকা বেয়ে গঙ্গার ওপারের চরে পৌঁছে আড্ডা মারা যাবে। রুবি-টি-বাবু বললেন, 'আমিও যাব। আমার একটা জাল আছে, চিংড়ি মাছ ধরব।' নতুন অভিজ্ঞতা হবে ভেবে তাঁকেও সঙ্গে নিলাম। সুদর্শন হাল ধরে বসল। নিয়মিত ব্যায়াম করা পেটা স্বাস্থ্য। সত্যিই সুদর্শন ছিল সে। আমরা পালা করে দাঁড় বাইতে-বাইতে নৌকা নিয়ে যাচ্ছি। আর রুবি-টি-বাবু ছপ্ ছপ্ করে জাল ফেলছেন মাঝে মাঝে। কখনও শূন্য, কখনও বা এক-আধটা চিংড়ি বা কুচো মাছ উঠছে জালে। পালু যেই গান ধরেছে, 'নীল গগনে ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা', রুবি-টি-বাবু সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করেন। মাছ পলাইয়া যাইব।' সুদর্শন বলল, 'এ বোংরাটাকে এনেই ভুল করেছি। গান হবে না, আড্ডা হবে না—চিংড়ি মাছ তো বাজারে প্রচুর পাওয়া যায়।' হঠাৎ রুবি-টি-বাবু বললেন, 'ওই দ্যাখেন, কালা মতন জায়গাটা। তাড়াতাড়ি ওইখানে চলেন, চিংড়ি মাছের ঝাঁক!'

প্রায় গঙ্গা পার হয়ে এসেছি। একটি জায়গা সত্যিই মনে হল কালো। যত জোরে সম্ভব দাঁড় বেয়ে এগিয়ে গেলাম। রুবি-টি-বাবু জাল নিয়ে কায়দা করছেন, হঠাৎ খস্ করে আটকে গেল নৌকা। বুঝলাম চরে আটকে গিয়েছে। প্রচণ্ড গতির জন্য অনেকটা ভিতরে চলে গিয়েছিল। সুদর্শন জলে নামতে দেখলাম, একহাঁটু জল। সে একা নৌকা নড়াতে পারছিল না। আমি আর চণ্ডীও নামলাম। দুজনে হালের কাছে ধরে ঠেলতে লাগলাম, সুদর্শন নৌকার সামনে অর্থাৎ উল্টো দিক দিয়ে ঠেলতে লাগল। রুবি-টি-বাবু গেঞ্জি গায়ে মুখ চুন করে বসে আছেন। পালু, বিকাশ, শোভনেন্দু তখন তাঁকে কথা দিয়ে ধোলাই দিচ্ছে।

নৌকা ঠেলতে-ঠেলতে হঠাৎ অতলে তলিয়ে গেলাম। বুঝলাম জলের তলায়, পাঞ্জাবি, ধুতি শরীরটাকে আঁকড়ে ধরেছে। দু হাত মাথায় দিয়ে পাছে নৌকার তলার ধাক্কা মাথায় না লাগে, আস্তে আস্তে ভেসে উঠলাম। চণ্ডীরও একই অবস্থা। নৌকায় উঠতে রুবি-টি-বাবু নিজের গায়ের ঘেমো গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে বললেন, 'ল্যান, গঞ্জিটা দিয়া মাথাটা মুইছা ফেলান, না হইলে সর্দি লাগব।' বললাম, 'আপনার গেঞ্জি আমার গায়ে ঠেকিয়েছেন কি আপনাকে জলে চোবাব।' সুদর্শন প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল, কারণ নৌকাটি ও-ই জোগাড় করেছিল। চরে ধাক্কা খেলে নৌকার তলায় ক্ষতি হতে পারে। রুবি-টি-বাবুকে উদ্দেশ করে সে বলল, 'এটাকে সাগরের জলে ফেলে দে। মাসী মাসী করে চেঁচিয়ে মরুক।'

দুর্গাচরণ স্কুল থেকে ১৯৪০ সালে আমরা আঠারো জন ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই। কেউ ফেল করেনি। হেড মাস্টারমশাই তার আগেই চলে গিয়েছেন। দুর্গাচরণ বা বাংলা স্কুলে কৃতী ছাত্রের অভাব হয়নি, তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন দেশে ও বিদেশে। আমার জানাশোনার মধ্যে সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত ওই দুর্গাচরণ স্কুলে পড়তেন আমাদের এক যুগেরও বেশি পরে।

ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি (টি.এন.জে.) কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন হরলাল দাশগুপ্ত। কেমিস্ট্রি পড়াতেন। কলেজেও আমরা কোনও স্বাধীনতা পাইনি, ইনি হেড মাস্টারমশাইয়ের চেয়েও কড়া। কথায় কথায় বলতেন, 'তোমাদের দ্বারা সায়েন্স হবে না, আর্টস নাও।'

১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় একদিন কলেজে গিয়ে দেখি ছাত্ররা গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগই বিহারি ছাত্র। কাউকে ক্লাসে যেতে দেবে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালে কেন্দ্র এবং বিহারের মন্ত্রী হয়েছিল। সেদিন দূর থেকে দেখলাম হরলালবাবু হেড অফিসের বড়বাবুর মতো গোঁফ নিয়ে গলাবন্ধ কোট ও প্যান্ট পরে একা হেঁটে আসছেন গেটের দিকে। সবাই হকচকিয়ে গেল। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'সবাই নিজের নিজের ক্লাসে যাও।' তারপর পিছন দিকে না তাকিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলেন সোজা চলে গেলেন সেইদিকে। আমরাও সুড়সুড় করে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলাম।

সেইদিনই বেলা দুটোর সময় খবর এল জওহরলাল গ্রেফতার হয়েছেন। ছাত্ররা অশান্ত হয়ে পড়েছিল। হরলালবাবু বুঝতে পেরেছিলেন সময় আসন্ন, এবার আগুন জ্বলবে। ছাত্রদের কোনও রকম ক্ষতি হওয়ার আগেই কলেজ বন্ধ করে দিলেন তিনি।

টি.এন.জে. কলেজের বেশির ভাগ অধ্যাপকই ছিলেন বাঙালি। খুব সুন্দর পড়াতেন। নিশাবাবু, সত্যেনবাবু ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছিলেন নিবিড়ভাবে। ইন্টারমিডিয়েটে কতটুকুই বা ইংরেজি পড়ানো হয়! কিন্তু ওঁরা সিলেবাসের বাইরের বই সম্বন্ধেও বলতেন। এক কথায় চসার থেকে জন মেস্‌ফিল্ড পর্যন্ত একটি প্রথমভাগ পড়ার মতো ধারণা তৈরি হয়েছিল। আমার বরাবরই সাহিত্য ভাল লাগত, আর বরাবরই আমাকে পড়তে হয়েছে বিজ্ঞান। সে জন্য কোনও দুঃখ নেই। হাসি মুখেই মেনে নিয়েছিলাম, কারণ জীবনে সব সময় নিজের ভাল লাগা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিজের ইচ্ছামতো পাওয়া যায় না, পূরণও হয় না।

বড় দিনের ছুটিটা একটু বাড়িয়ে আমরা দশ-বারো দিন করে নিতাম। আমরা সাত-আট জন দু'তিনটে তাঁবু, খাবারদাবার, রান্নার লোক, একটি বন্দুক নিয়ে মান্দার হিল থেকে আরও দশ মাইল দূরে রাজাপোখরের জঙ্গলে

ক্যাম্প করতাম। চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গল সুন্দর লাগত খুব। কখনও-সখনও চিতা বাঘ, অসংখ্য ময়ূর আর বন-মুরগি দেখা যেত। নিজেরা তাঁবু খাটিয়ে, ভিতরে খড়ের উপরে শতরঞ্জি, তার উপরে কম্বল দিয়ে ঢালাও বিছানা করা হত। প্রচণ্ড শীতে হাত-পা জমে যেত রাতে। উদ্দেশ্য একটিই—জমিয়ে আড্ডা। সকালে পাথর বেয়ে পাহাড়ে ওঠা নামা, কুয়োর জলে স্নান, খাওয়া-দাওয়া, দুপুরে আবার বেরিয়ে পড়া গভীর জঙ্গলের উঁচু-নিচু পথে। সন্ধ্যায় ক্যাম্প-ফায়ার। আগুন জ্বেলে অবিশ্রান্ত গান আর কবিতা পাঠ। রম্যরচনাও বাদ পড়ত না। এই দশ দিনে হাতে লেখা একটি দৈনিক কাগজ বেরুত। সারা দিন কে কী করেছে তাই নিয়ে ব্যঙ্গ করে লেখা। 'টর্পেডো' ছদ্মনামে লেখা হত, আর ক্যাম্প ফায়ারে পড়া হত সবার সামনে। কেউই ঠিকঠাক জানতাম না টর্পেডো কে। পরে জেনেছিলাম, শোভনেন্দু।

শোভনেন্দুর মতো প্রতিভাবান ছাত্র আমি জীবনে দেখিনি। কালিদাসের 'মেঘদূত' যেমন অনর্গল আওড়াতো, তেমনই রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপিয়ার। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক নাম-করা লেখকের লেখার সঙ্গে পরিচয় ছিল। এদিকে সে বিজ্ঞানের ছাত্র! পাটনা ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় চতুর্থ এবং ইন্টারমিডিয়েটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স নিয়ে এম.এস.সি. পরীক্ষায় প্রথম হয়। আমাদের গানের সঙ্গে সুন্দর এস্রাজ বাজাত সে। চোখে মাইনাস পাওয়ারের ভারী চশমা পরেও ফুটবল খেলত লেফট্ আউট-এ। একবার ওরই ছোটভাই প্রবালের সঙ্গে ধাক্কা লাগে খেলার সময়। চশমা ছিটকে যায় শোভনেন্দুর, আর প্রবাল পড়ে যায় মাটিতে। কিন্তু আধা-অন্ধ অবস্থাতেও বল ছাড়েনি শোভনেন্দু। প্রবালের মাথাটাকে বল ভেবে সমানে লাথি চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি পিছন থেকে টেনে সরিয়ে দিই। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করার পর গত বছর মারা গিয়েছে আমার এই বন্ধু।

রাজাপোখরের দিনগুলি ছিল সত্যিই সুন্দর। আমাদের বন্ধুত্বও গাঢ় হয়ে উঠেছিল দিন-দিন। এতই যে, আমরা এই ক'জন যে যার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বন্ধু ছিলাম। এই বৃদ্ধ বয়সেও দেখা হলে চলত সেই নির্জলা আড্ডা। আমাদের মধ্যে কেউই কোনও দিন রাজনীতি করেনি। রাজনীতি নিয়ে কোনও আলোচনাও হত না। যে যার সাধ্যমতো বহু ছেলেকে কাজে ঢুকিয়েছে, সহৃদয়তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছে অসহায় মানুষের পাশে।

রাজাপোখরে একদিন সন্ধ্যার একটু আগে চণ্ডী ফিসফিস করে বলল, 'তুই চুপিচুপি ওই পাহাড়টার কাছে গিয়ে দাঁড়া, কেউ যেন না দেখে। আমি আসছি।' আমি কোনও কিছু না ভেবেই চলে গেলাম সেখানে। বেশ

কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, পাহাড়ের মাথায় ফুটে উঠেছে সন্ধ্যাতারা। এমন সময় চণ্ডী এল। হাতে বন্দুক, সঙ্গে দুটি এল জি আর দুটি এস জি টোটা। বলল, 'আজ লেপার্ড মারব।' অবাক হয়ে বললাম, 'লেপার্ড কি মুরগি নাকি যে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে?' ও বলল, 'আয় না।'

আমরা দুজনে সেই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রায় আধ মাইল হেঁটে একটা পনের-কুড়ি ফুট উঁচু বোল্ডার দেখলাম। চণ্ডী আগেই দেখে রেখেছিল। খাড়া বোল্ডারে ওঠা বেশ শক্ত, তার উপর অন্ধকার। অনেক কষ্টে উঠলাম। দেখলাম, চণ্ডী আগেই কিছু ডাল পাতা কেটে একটি ছোট্ট ঝোপ তৈরি করে রেখেছে। কখন যে এসব করল জানি না। দুজনে চুপচাপ বসে আছি। মশা ছেঁকে ধরেছে, তার উপর ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে হাত পা অসাড় হবে। এইভাবে এক ঘণ্টা থাকার পর আমার আর ধৈর্য থাকল না। উসখুস করতে করতে বললাম, 'দূর, লেপার্ড-ফেপার্ড নেই এখানে, ক্যাম্পে চল।'

যেতে আর হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি সারা ক্যাম্প টর্চ নিয়ে চিৎকার করে আমাদের নাম ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছে। সেই আওয়াজে লেপার্ড কেন রয়াল বেঙ্গলও পালাত।

আমার শিকার এখানেই শেষ। কিন্তু চণ্ডীর বেলায় এটাই শুরু। এই শিকার ওকে সর্বস্বান্ত করেছিল। একটি বিশিষ্ট ও ধনী পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় শুধু ওর শিকারের নেশায়।

ভাগলপুর ছাড়ি ১৯৪৩ সালে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৩, এই দশ বছরের দিবসরাতের যত আনন্দ সঙ্গে নিয়ে চলে আসি ভাগলপুর থেকে কলকাতায়। এই শহর আমার কাছে অপরিচিত ছিল না, আমার জন্মই তো কলকাতায়। তা ছাড়া বছরে দু তিনবার কোনও না কোনও কারণে কলকাতায় আসা হয়ে যেত। কিন্তু ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ কলকাতায় আমাদের ছাত্রজীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রকোপ, অন্যদিকে মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ। সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া মহামারী। কলকাতার রাস্তায় তখন অনাহারে মৃতদেহের ছড়াছড়ি। এ মৃত্যু যে কত নিষ্ঠুর, বিকৃত দেহগুলির ভয়াবহ চেহারা দেখলেই তা বোঝা যেত।

১৯৪৬-এ ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে নিউ থিয়েটার্স-এ ঢুকলাম একটি প্রশ্ন নিয়ে। সেই একই প্রশ্ন নিয়ে ১৯৫০-এ গেলাম ইংল্যান্ডে, পাইনউড স্টুডিয়োতে কাজ শিখতে। কলকাতায় ফিরে এসে হাত দিই ছবি পরিচালনার কাজে। চল্লিশ বছর ধরে ছবি করছি, ছবির সংখ্যাও হল চল্লিশ। কিন্তু, যে-প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য ছবি পরিচালনার কাজে এসেছিলাম, সে-প্রশ্নের উত্তর আজও পাইনি।

৩

১৯৪৬ সালে শ্রাবণের এক বৃষ্টিঝরা বিকেলে নিউ থিয়েটার্সের দরজায় টোকা মারলাম। কাজ আমার আগেই হয়ে গিয়েছিল। সহকারী শব্দযন্ত্রীর কাজ, শিক্ষানবিশ হিসাবে। দারোয়ানের হাতে স্লিপ দিয়ে অপেক্ষা করছি, খানিক পরে ডাক পড়ল। স্টুডিয়ো ম্যানেজার জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী, মিষ্টভাষী, বিদ্বান ও নিরহঙ্কারী মানুষ বাণী দত্তর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই নিন আপনার সহকারী।'

যদিও সেটাই আমার প্রথম স্টুডিয়ো দর্শন, তবু মনে হয়েছিল আমি অনেক কিছুই জানি। কারণ আর কিছুই নয়, সপ্তাহে চার-পাঁচটি বিদেশি ছবি দেখা, আর সেই সঙ্গে সিনেমা সংক্রান্ত বিদেশি ম্যাগাজিন পড়া। ফলে ছবি কী করে তৈরি হয়, সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু, বই পড়ে জানা আর হাতে কলমে কাজ করার মধ্যে অনেক তফাত। সেকালে ছবির জগতে শব্দযন্ত্রীরা ছিলেন সবচেয়ে শিক্ষিত। অতুল চ্যাটার্জি, মধু শীল, নৃপেন পাল প্রমুখ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের নামকরা ছাত্র। এঁরা কেউ ফিজিক্সে, কেউ কেমিস্ট্রিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখনকার দিনে এঁদের পক্ষে অন্য যে কোনও ভাল কাজ পাওয়া খুব সহজ ছিল, কিন্তু এঁরা ছবির জগতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নতুনত্বের সন্ধানে—এক অনাস্বাদিত অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়।

তখন ফরেন এক্সচেঞ্জ পাওয়ার ব্যাপারেও কোনও ঝামেলা ছিল না। নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে বললেই একটা প্লে-ব্যাক মেশিন আনিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু বাণীদা মুকুল বোসের তত্ত্বাবধানে স্টুডিয়োতেই একটি প্লে-ব্যাক মেশিন তৈরি করে ফেললেন। যতদূর জানি, এটিই ভারতবর্ষে তৈরি প্রথম প্লে-ব্যাক মেশিন। মুকুল বোসের কোনও ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ছিল না, কিন্তু শৈশব থেকেই তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। কৈশোরে সারা দিন কাটাতেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ল্যাবরেটরিতে।

জগদীশচন্দ্র এটা-ওটা এনে দিতেন তাঁকে। হয়তো এই কারণেই যে

কোনও যন্ত্র অতি সহজেই মুকুলদার বন্ধু হয়ে যেত। যন্ত্রকে ভাল না বাসলে, যন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলে, সে যন্ত্রকে দিয়ে ভাল কাজ করানো যায় না। দশ বছরের পুরনো সাউন্ড মেশিন বাইরে থেকে দেখলে মনে হত যেন গতকাল কেনা হয়েছে। ঝকঝক তকতক করত।

যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে মুকুলদার অগাধ পান্ডিত্য শুধু শব্দযন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যে কোনও নতুন বিদেশি গাড়ি বা মোটর সাইকেল আগেই খুলে ফেলতেন, তারপর ভিতরটা পর্যবেক্ষণ করে আবার আস্তে আস্তে ফিট করে দিতেন। বাড়িতে তাঁর ঘরে ঢুকবার অধিকার ছিল না কারও। জীবনে ধুলো ঝাড়া হত না। একরাশ যন্ত্রপাতির সঙ্গে ঘর করতেন অকৃতদার মুকুলদা। কোনও কিছু নিয়ে কাজ করতে করতে স্ক্রুর প্রয়োজন হলে একটা ম্যাগনেট খাটের তলায় ধরতেন, রাশি রাশি স্ক্রু উড়ে এসে ম্যাগনেটের গায়ে লাগত, ওর মধ্য থেকে যেটা দরকার বেছে নিতেন তিনি। ট্রান্সমিটার তৈরি করেন ১৯৩৭ সালে। সেই ট্রান্সমিটারে কথা বলতে পারতেন। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে ইউরোপ, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্টেশনের সঙ্গে গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করে সেটা।

তখন শব্দগ্রহণের কাজ হত আর. সি. এ. মেশিনে। অতুল চ্যাটার্জি সে যুগে আর. সি. এ. কোম্পানিকে লিখে পাঠান, সাউন্ড ক্যামেরায় একটি এক্সপোজার মিটার লাগালে এক্সপোজার ঠিক হচ্ছে কিনা বোঝা যাবে। অতুলদার কথা মতো আর. সি. এ. কোম্পানি তার পরের মডেল পি. এম. ৩৫-এ এক্সপোজার মিটার লাগালো। এমনই ছিল তাঁদের প্রতিভা এবং কর্মকুশলতা।

কতদিন দেখেছি শুটিং শেষে আমগাছতলায় সাউন্ড ভ্যান আনিয়ে নিঃশব্দে কাজ করছেন লোকেন বসু একা, মধ্যরাত পর্যন্ত। শুধুই কাজের তাগিদে, ওভারটাইমের জন্য নয়। মাত্র দুটি মাইক্রোফোন দিয়ে গান রেকর্ডিং হত। সেই সব বিখ্যাত গান গেয়েছিলেন সায়গল, কানন দেবী, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং নবাগত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

নিউ থিয়েটার্সে পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন নীতিন বসু, দেবকী বসু, হেমচন্দ্র চন্দ এবং 'উদয়ের পথে'-খ্যাত তখন উদীয়মান বিমল রায়। প্রমথেশ বড়ুয়া তখন নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে দিয়েছেন। ভারতীয় ছবিতে কম্পোজিশন ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে নীতিন বসুর অবদান। কত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যে করতেন! আর এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার।

আমার প্রিয় পরিচালক ছিলেন বিমল রায়। তখন তিনি 'অঞ্জনগড়' নামে একটি ছবি করছিলেন, তাঁর ইউনিটে সহকারী শব্দযন্ত্রী হিসাবে যুক্ত হই আমি। ভবিষ্যতে পরিচালক হওয়ার জন্যই আমি সিনেমায় ঢুকি, তাই

রেকর্ডিং-এর সময়টুকু ছাড়া তাঁর কাজ দেখতাম।

বিমল রায়কে কোনও দিন ফ্লোরে বসে থাকতে দেখিনি। নিজে ক্যামেরাম্যান ছিলেন, তাই সারাক্ষণ লাইটিং করতেন। তন্ময় হয়ে দেখতাম। বড় সুন্দর, সুষমামন্ডিত লাইটিং। 'উদয়ের পথে' ছবিতে চাঁদের আলোর লাইটিং—নিউজলস্ স্প্রে করে কুয়াশা তৈরি—একটি নতুন ধরনের ভিস্যুয়াল আনে 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গানটিতে।

তবে এঁদের কাজে সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানা থাকলেও হলিউডের ছাপ থেকেই যেত।

হেমচন্দ্র ছিলেন অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের পরিচালক। চলচ্চিত্রে অভিনয় শিল্পের উপর তাঁর মতো দখল আর কারও ছিল না। অভিনয় শেখাবার জন্য দিনের পর দিন রিহার্সাল দেওয়াতেন। ক্যামেরার সামনে কী করে চলতে হয়—যাকে বলে ফুট-ওয়ার্ক—শেখাবার জন্য একজন অভিনেতাকে হাজারবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠাতেন আর নামাতেন। অভিনয় দিয়ে নাটক জমিয়ে তোলা বিশেষত্ব ছিল তাঁর।

সত্যি বলতে, স্টুডিয়োতে ঢোকবার আগে ভারতীয় ছবির সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। মাথায় তখন ঘুরছে ফোর্ড, ওয়াইলার, বিলি ওয়াইল্ডার, ক্যারল রীড, কাপ্‌রা। কিন্তু স্টুডিয়োতে ঢুকে পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী ও অন্যান্যদের একনিষ্ঠতা, পরিশ্রম এবং চলচ্চিত্রের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ দেখে নতুন করে ভালবাসলাম সিনেমাকে।

দুই দিকপাল সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সে-যুগে, রাইচাঁদ বড়াল আর পঙ্কজকুমার মল্লিক। আমার ধারণা, রাইচাঁদ বড়ালের মতো সঙ্গীত পরিচালক আজও হয়নি। অবাক লাগে ভাবতে তাঁর যথাযথ মূল্যায়নও হয়নি। তাঁকে বোঝবার চেষ্টাও করা হয়নি। গানের সুরে কত যে অভিনবত্ব এনেছেন তিনি, কত নতুনত্ব, নতুন কিছু পাওয়ার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা! গানের ব্যাকগ্রাউন্ডে সিম্ফনি, অথচ কানন দেবী বা সায়গল যা গাইছেন তা খাঁটি দেশি। দেশ, খাম্বাজ, ভৈরবী ইত্যাদির সঙ্গে কীর্তনের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

রাইদা এবং পঙ্কজদার জন্য একটি বাগানবাড়ি ধরনের বাড়ি ছিল। বাঘা-বাঘা বাজিয়ে মাস মাইনেতে বহাল থাকত। সারা বছর গানের সুর করা হত ওদের নিয়ে। যেদিন শুটিং থাকত না, সেদিন পালিয়ে পৌঁছে যেতাম ওখানে। অকৃত্রিম স্নেহ পেয়েছিলাম রাইদা, পঙ্কজদার কাছে। পরবর্তীকালে আমার 'লৌহকপাট' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হয়েছিলেন পঙ্কজদা।

একদিন, মনে আছে, পঙ্কজদা গাইছেন, 'সর্ব খর্ব তারে দহে তব ক্রোধ দাহ'। দরাজ কণ্ঠ। আমি পিছনে বসে চুপিসাড়ে ওঁর পিঠে কান রেখে

শুনতে লাগলাম। সমস্ত শরীর প্রকাশিত হয়ে উঠল। পঙ্কজদা হেসে বললেন, 'এ ছেলেকে নিয়ে আর পারা যায় না।' এই গানটি দেওয়া হয়েছিল 'অঞ্জনগড়' ছবিতে, গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখার্জি।

পঙ্কজদা অনেক সময় কাজ করতেন ক্যাসানোভার অর্কেস্ট্রা নিয়ে। যঁতদূর মনে আছে কাননদেবীর গাওয়া 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়' গানটিতে সংগত করেছিল ক্যাসানোভার অর্কেস্ট্রা। আমার ভুলও হতে পারে। কাননদেবীর গাওয়া 'পায়ে চলার পথের কথা' গানটি রাইদার একটি অনবদ্য সৃষ্টি। কত যে ছন্দ, তাল-ফেরতা, সুর ও কথা নিয়ে কত যে খেলা, তা আজকের দিনে কল্পনা করা যায় না।

নিউ থিয়েটার্স একই সঙ্গে হিন্দি ও বাংলা ছবি করত। রাইদা উর্দু গানে কীর্তন লাগিয়ে সারা ভারতবর্ষ মাতিয়ে দিলেন। হিটের পরে হিট গান। কিন্তু সে গান খালি গলায় গাইলে জমত না, একইভাবে অর্কেস্ট্রার সঙ্গে মেশানো থাকত। আসল কথা, সব কিছুর পিছনে প্রচণ্ড পরিশ্রম, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং সঙ্গীত শিল্পের উপর অসামান্য দখল ছিল রাইদার। দুঃখ এই, আজ আর কেউই রাইচাঁদ বড়ালকে নিয়ে আলোচনা করে না।

মাত্র দু বছর ছিলাম নিউ থিয়েটার্সে। 'ক্যালকাটা মুভিটোন' নামে একটি নতুন স্টুডিয়ো তৈরি হচ্ছিল, বাণীদা তার প্রধান যন্ত্রশিল্পী হিসাবে কাজ নিলেন। আমাকে ডাকলেন স্বাধীন শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ করার জন্য। চলে গেলাম।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োটি ছিল খুব সুন্দর। দশ বিঘা জমি। মিস্টার সরকার দেশবিদেশ থেকে নানা রকমের গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। ক্রমে গাছগুলি বিশাল হয়ে উঠেছিল। কত রকমের পাখি আসত সে সময়। একটা গাছে দু রঙের ফুল হত। বৃষ্টির সময় বড় সুন্দর লাগত দেখতে। একটা টেনিস কোর্টও ছিল, মাঝে মাঝে ক্রিকেট পিটতাম সেখানে।

সবচেয়ে বড় অবদান, নিউ থিয়েটার্স অনেক ভাল টেকনিসিয়ান তৈরি করেছিল। এঁদের অধিকাংশই বম্বে চলে যান। এক কথায়, চলচ্চিত্রের প্রাথমিক শিক্ষার একটি উপযুক্ত স্থান ছিল নিউ থিয়েটার্স।

ক্যালকাটা মুভিটোনে যোগ দেওয়ার সময় বহু মানুষের সঙ্গে মিলে সাত বিঘা জমির উপর একটা ফিল্ম স্টুডিয়ো নিজের হাতে তৈরি করার অভিজ্ঞতা বিরাট। যদিও আর. সি. এ.-র ইঞ্জিনিয়াররা এসে অসংখ্য প্যানেল একটু একটু করে জুড়ে মেশিন ফিট করলেন, তবু তাদের সঙ্গে থেকে, কাজ দেখে, লিটারেচার পড়ে অনেক জানলাম, অনেক শিখলাম। এই সময়ে নতুন করে পেলাম ফিজিক্সে বাণীদার গভীর জ্ঞানের পরিচয়। আনকোরা নতুন মেশিনে কাজ করতে খুব ভাল লাগত। একটা নতুন মিচেল ক্যামেরাও এল। ফ্লোরের মধ্যে অ্যাকোয়াস্টিক্সের কাজও দেখলাম।

স্টুডিয়ো চালু হল এক বছর পরে। তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে সবে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনের ঘুড়ির মতো রাশি রাশি কালো টাকা উড়ছে কলকাতার আকাশে। সুতরাং ওয়ার-টাইম প্রোডিউসারের অভাব নেই। চার-পাঁচদিন করে শুটিং হয় আর বন্ধ হয়ে যায়। আমিও সাউন্ডে হাত পাকাই। নানা রকমের এক্সপেরিমেন্ট করি। জানতাম কোনও দিনও শেষ হবে না ছবিগুলি। অবসর সময়ে চৌরঙ্গি পাড়ায় আমেরিকান আর ব্রিটিশ ছবি দেখতাম। বাণীদা আমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

সে-যুগে অপটিক্যাল সাউন্ড রেকর্ডিং-এর বাঁধাধরা নিয়ম ছিল। যেমন বাজ পড়ার আওয়াজ বা গুরুগুরু মেঘের ডাক তোলার জন্য সোজাসুজি কালবৈশাখীর নীচে মাইক্রোফোন ধরা যেত না। শব্দের প্রচণ্ডতায় ছিঁড়ে যেত গ্যালভানোমিটার। ভাবতাম, কী করে বাজপড়া বা মেঘের ডাক তোলা যায়।

একদিন হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা পুরনো ভাঙা বিশাল জলের ট্যাঙ্ক পড়ে আছে মাঠে। বাণীদাকে বললাম, একটু মেঘের ডাক, বাজ পড়ার আওয়াজ রেকর্ড করার চেষ্টা করব ? তিনি সানন্দে রাজি হলেন, জিজ্ঞেসও করলেন না কী করতে চাইছি। একটা চেয়ার টেনে বসে তামাশা দেখতে লাগলেন।

আমি ট্যাঙ্কের মধ্যে মাইক্রোফোন সুদ্ধু বসিয়ে দিলাম বুম্‌ম্যানকে। আমার সহকারীকে বললাম, ট্যাঙ্কের উপর তবলার রেলার মতো বাজাতে একটু জোরে। শুনে দেখলাম মন্দ হচ্ছে না। তারপর একটা খবরের কাগজ ট্যাঙ্কের মুখের কাছে কড়-কড়-কড়াৎ করে ছিঁড়তে বললাম। রেকর্ড করে ল্যাবরেটরিতে পাঠালাম ডেভেলপ করার জন্য। স্কোরিং থিয়েটারে সাউন্ড শুনে অবশ্য বুঝলাম কিছুই হয়নি। বাণীদা হাসতে হাসতে বললেন, জানতাম হবে না। অন্য উপায় ভাবো। এইভাবে আমাদের কাজ চলত।

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' ছবির শুটিং হচ্ছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, সুনন্দা দেবী, জহর গাঙ্গুলি প্রমুখ সে-যুগের বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ। বিদ্যাপতি ঘোষ ক্যামেরাম্যান। তিনি তখন জার্মানির ইউফা স্টুডিয়ো থেকে দেশে ফিরেছেন, সঙ্গে জার্মান স্ত্রী। তিরিশের দশকের শেষে 'নীচানগর' ছবির কাজের জন্য কান্ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছিলেন বিদ্যাপতি ঘোষ। এইসব হংসের মধ্যে বক যথা তরুণ, অনভিজ্ঞ শব্দযন্ত্রী আমি।

খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল অহিনদার সঙ্গে। সাউন্ডট্র্যাকের সামনে একটা চেয়ারে বসতেন আর সেকালের স্টেজের গল্প করতেন। বিদেশের স্টেজের ইতিহাসও তাঁর জানা ছিল। মাঝে মাঝে খুব আস্তে আস্তে কী সুন্দর করে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে আবৃত্তি করতেন। তখন তাঁকে

স্টেজের অহীন্দ্র চৌধুরী মনে হত না।

অহিনদার বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরি। অধিকাংশ সময় কাটাতেন পড়াশুনো করে। একদিন শুটিং-এর সময় বিদ্যাপতি ঘোষ লাইটিং করছেন। রাসবিহারীরূপী অহীন্দ্র চৌধুরী বিছানায় শুয়ে। পাশে গল্প করছেন জহর গাঙ্গুলি ও সুনন্দা দেবী। মাইক্রোফোনে সব শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ কানে এল অহিনদার নাক ডাকার আওয়াজ—যত সময় যাচ্ছে ততই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ পরে বিদ্যাপতি ঘোষ বললেন, 'রেডি'। পরিচালক আমাকে বললেন, 'রিহার্সাল'। অহিনদা তখনও নাক ডাকছেন। কিন্তু সুনন্দা দেবী সংলাপ বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে নাকডাকা থেমে গেল এবং পর মুহূর্তেই সংলাপ বলতে লাগলেন অহিনদা।

শটের পর তিনি বাইরে বেরিয়ে আসতে বললাম, 'আজ দেখালেন ! ঘুমন্ত অবস্থায় নির্ভুল সংলাপ বললেন কী করে ?' অহিনদার সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'স্টেজে হাজারবার রাসবিহারী করেছি। প্রত্যেকের সংলাপ আমার কণ্ঠস্থ। এ কি সিনেমা হচ্ছে ? এ তো স্টেজ ! আর ভাল লাগে না।' আমার জানাশোনা বিশ্বের বিখ্যাত অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র অহীন্দ্র চৌধুরীই ঘোষণা করেছিলেন অমুক দিন থেকে আমি অভিনয় জীবন থেকে অবসর নেব। নিয়েওছিলেন তাই।

তেমন ভাল চলছিল না স্টুডিয়ো। তার কারণ আমাদের প্লে-ব্যাক মেশিন ছিল না। গান ছাড়া বাংলা ছবি হয় না। সুতরাং স্টুডিয়ো নতুন হলেও, যেখানে প্লে-ব্যাক মেশিন নেই সেখানে পার্টি আসে না।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছিলাম বাণীদা গভীরভাবে ড্রয়িং করে চলেছেন। হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন, 'দেখ তো, একটা তিন বাই চার গিয়ারের ড্রয়িং হয়েছে কি না !' দেখলাম, নিখুঁত ড্রয়িং। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন গিয়ারকে তিন বাই চার-এর রেশিওতে লাগাবো ?' বললেন, 'মুভিওয়ালাটাকে প্লে-ব্যাক মেশিন করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যখন আর টাকা ঢেলে প্লে-ব্যাক মেশিন কিনবেন না বলে স্থির করেছেন, তখন আমাদেরই কিছু একটা করতে হবে। মুভিওয়ালার আর পি এম ১৫০০ আর ক্যামেরার আর পি এম ১৪৪০, সুতরাং তিনের চার রেশিওতে একটা গিয়ার কাটিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

হাওড়া থেকে এল লেদ মেশিনের লোক। সব মাপজোক নিয়ে দিন পনেরোর মধ্যেই নতুন গিয়ার তৈরি করে দিয়ে গেল সে। লাগানো হল। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল রোজ মুভিওয়ালাতে হাজার ফিটের একটা ডামি ফিল্ম রোল চাপিয়ে স্টপ ওয়াচ্ হাতে নিয়ে চালানো আর দেখা প্রতি মিনিটে ৯০ ফুট চলছে কি না। দেখি একেবারে অঙ্কের মতো ঠিক।

তখনকার দিনের বিখ্যাত পরিচালক অজয় কর স্টুডিয়ো দেখতে এলেন। তিনি নিজে ক্যামেরাম্যান। সুতরাং নতুন মিচেল ক্যামেরা দেখে খুব খুশি। বললেন, 'সব কিছুই তো সুন্দর। তবে শুনলাম আপনাদের নাকি প্লে-ব্যাক মেশিন নেই?' আমি বললাম, 'কে বললে? আমরা শেফিল্ড থেকে নতুন প্লে-ব্যাক মেশিন আনিয়েছি।' বলে মুভিওয়ালা আর গিয়ার দেখিয়ে বললাম, 'হাওড়া—হাওড়া, শেফিল্ড অব ইন্ডিয়া।'

একদিন স্টুডিয়োতে আসার সময় দেখি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে একটা লোক আমগাছের চারা বিক্রি করছে। আট আনায় একটা চারা কিনলাম। স্টুডিয়োর চিফ ইলেকট্রিসিয়ান হরেনবাবুর সঙ্গে পুকুরপাড়ে পুঁতলাম চারাটা। তখন ভরা বর্ষা, রোজ জল দেওয়ার প্রয়োজন হত না।

প্রায় বছর কুড়ি পরে আমার কোনও একটা ছবির সেট পড়েছিল ক্যালকাটা মুভিটোনে। স্টুডিয়োতে ঢুকতেই সবাই ছুটে এল। হরেনবাবু আমার হাত ধরে বললেন, 'কত বছর পরে এলেন। আগে একটা জিনিস দেখাই।' দেখলাম একটা বিরাট আমগাছ। তার ডালে ডালে মুকুলের মেলা। হরেনবাবু বললেন, 'মনে আছে?' বললাম, 'ছিল না, মনে পড়ল।' এইভাবে কত কাণ্ড যে করেছি, আজ আর সব মনে পড়ে না।

তবে নিয়মিত বিদেশি ছবি দেখা আর বই পড়া ঠিকই চলছিল। কখনও মেট্রো কখনও লাইটহাউসে প্রায়ই দেখতাম একটি লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে টিকিটের লাইনে। পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়।

একদিন বেলা দুটো থেকে রাত দশটা অব্দি একটা শিফ্‌ট পড়ল। রাতে কাজ করা ধাতে সইত না আমার। তবে বাণীদার বয়স হয়েছে, বাধ্য হয়ে রাজি হলাম। সন্ধ্যা ছটা বেজে গেল, পার্টির পাত্তা নেই। সবাই খুব বিরক্ত। এমন সময় হরেনবাবু হাতে একটা ছিপ নিয়ে বললেন, 'মাছ ভাজা খাবেন?' বললাম, 'আনুন।' স্টুডিয়োর পুকুরের একধার থেকে একটি ৫০০ ওয়াটের আলো ফোকাস করে অন্ধকারে ফেললেন হরেনবাবু। তার আগে ফেলেছিলেন একটু মশলা। একটু পরেই ছিপ ফেললেন। মুহূর্তে উঠে এল সের-দেড়েকের একটা রুই। আধঘণ্টার মধ্যে তিন-চারটে প্রায় একই সাইজের রুই ধরা হল। একটা করে মাছ ওঠে আর সোজা ক্যান্টিনে চলে যায়—সুকান্ত ভট্টাচার্যের মোরগের মতো। সেদিন পেটভরে মাছ ভাজা খাওয়া হল, সঙ্গে চা। শুধু একটা ব্যাপারই ভুলে গিয়েছিলাম, স্টুডিয়োর পুকুরে মাছ ধরা দণ্ডনীয় অপরাধ।

পরের দিন বিরাট হইচই। অফিসে বাণীদার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল স্টুডিয়ো ম্যানেজারের। বাণীদা আমাকে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কই, আমার মাছ ভাজার শেয়ার কই?' একজন

দৌড়ে ক্যান্টিনের দিকে যেতেই বাণীদা বললেন, 'দু-প্লেট এনো। একটা প্লেট স্টুডিয়ো ম্যানেজারকে দিতে হবে।'

'দি রিভার' ছবি তুলতে কলকাতায় এলেন জাঁ রেনোয়াঁ। ক্যালকাটা মুভিটোনে একটি মেয়ে, প্যাট্রিসিয়ার টেস্ট নেওয়া হয়েছিল। পরে সে-ই ধারাভাষ্যের কাজ করে। রেনোয়াঁ সঙ্গে করে এনেছিলেন ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিকের তৈরি পৃথিবীর প্রথম ম্যাগনেটিক সাউন্ড রেকর্ডিং মেশিন। সঙ্গে ইংল্যাণ্ড থেকে চার্লস পুলটন এলেন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে।

কী কারণে জানি না, পুলটনের পছন্দ হল আমাকে। তাঁর সহকারী হিসাবে নিতে চাইলেন। এদিকে স্টুডিয়ো আমাকে ছাড়তে চায় না। যাই হোক, বাণীদা আমার পরিচালক হওয়ার পরিকল্পনা জানতেন সেই নিউ থিয়েটার্সের সময় থেকেই। তিনি ছ'মাসের ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন। নতুন উৎসাহে পুলটনের সঙ্গে লেগে গেলাম ম্যাগনেটিক মেশিন ফিট করার কাজে।

শুটিং শুরু হল। স্ক্রিপ্ট্ আগেই পড়েছি, রুমার গডনের লেখা বইটিও পড়া ছিল। একটা সাধারণ প্রেমের গল্প, তার ছত্রে ছত্রে ভারতবর্ষের ভুল ব্যাখ্যা। কিন্তু, গল্প যেমনই হোক, রেনোয়াঁর শিল্পীমনের পরিচয় পেতে শুরু করলাম তাঁর ডিটেল কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁরই ভাইপো ক্লদ্ রেনোয়াঁ ছিলেন ছবির ক্যামেরাম্যান। অসাধারণ কাজ করছিলেন তিনি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা—মানে সাউন্ড ডিপার্টমেন্ট—ডোবাচ্ছিলাম। বিরাট টেকনিকালার ক্যামেরা লোড নিতে পারছিল না। পুলটনের আর ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিকের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে অনেক রাত কাজ করে শেষ পর্যন্ত বাধা দূর হল। কাজ নির্বিঘ্নেই চলছিল। এই সময় হঠাৎ মারা গেলেন আমার বাবা। আমি রেনোয়াঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম মায়ের কাছে। দু-তিন মাস পরে যখন কলকাতায় ফিরলাম, তখন ওঁরা কাজ শেষ করে চলে গেছেন।

আমার স্বপ্ন, পরিচালক হওয়ার জন্য আমি এবার উঠেপড়ে লাগলাম। গত চার বছর হাতে-কলমে কাজ শিখেছি, সাহিত্য পড়া আমার নিত্যসঙ্গী। পড়েছি বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের লেখা। লিখেছি ছোট ছোট অসংখ্য চিত্রনাট্য, আবার ছিঁড়েও ফেলেছি। এমন সময় ক্যালকাটা মুভিটোন থেকে আবার ডাক এল। বললাম, 'মাস ছয়েক থাকতে পারি। আর সাউন্ড রেকর্ডিং ভাল লাগছে না।' তা-ই ঠিক হল।

হঠাৎ একদিন হলিউড থেকে 'রিভার' ছবির প্রযোজক জানালেন, প্যাট্রিসিয়ার কমেন্টারি নতুন করে রেকর্ড করতে পারলে খুশি হবেন। রাজি হয়ে গেলাম। প্যাট্রিসিয়া তখনও কলকাতাতে, এক মাসের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে বরাবরের মতো। সুতরাং ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করতে

হবে।

স্টুডিয়ো ফ্লোরের মধ্যে কম্বল দিয়ে একটা ছোট্ট ঘর তৈরি করলাম আমি। বাণীদাও বাধা দিলেন না। প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে ওদের লোক এল। রেকর্ডিং করে পাঠিয়ে দিলাম। সাউন্ড প্রসেসিং হবে হলিউডে। যথাসময়ে রিপোর্ট এল, শব্দ ওভার-ড্যাম্‌ড্‌ হয়েছে। বুঝলাম কম্বলের ঘর তৈরি করা ঠিক হয়নি। এও বুঝলাম, কাজটা ঠিকঠাক শিখিনি।

একদিন বম্বে থেকে মুকুলদা এলেন। মুকুল বোস। তখন আমি কী একটা ছবির রেকর্ডিং করছি, নাম মনে নেই। দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে নামালাম তাঁকে। একটি পায়ে জন্ম থেকেই তাঁর কষ্ট ছিল।

সাউন্ড ট্র্যাকে আমার পিছনে বসলেন মুকুলদা। বললেন, 'বাণীবাবু তোমার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তুমি নাকি খুব ভাল গান রেকর্ড করো। খুব ভাল।' ইতিমধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠল, রিহার্সাল নিতে হবে। পিছনে মুকুলদা, আমার বুক কাঁপছে। পর পর দুটো রিহার্সাল নিয়ে মুকুলদাকে বললাম, 'ঠিক আছে মুকুলদা ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বেশ তো ব্যালান্স করছ।' রেকর্ডিং করে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরকম লাগল, মুকুলদা ? ঠিক আছে তো ?' বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।' আমিও ডিক্টোফোন দিয়ে বলে দিলাম, 'ও.কে.'। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুকুলদা বললেন, 'তোমাকে দশের মধ্যে এক দিলাম।' আমি তো বিমূঢ়।

এরপর মুকুলদা যা বললেন, তা চিরকাল মনে রেখেছি। বললেন, 'সাউন্ড রেকর্ডিংও একটা আর্ট। সেটা শুধু গান রেকর্ডিং-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সংলাপ রেকর্ডিং-এর মধ্যেও আনতে হবে। এই যে লম্বা শট্‌টি নিলে, তোমার প্রখর স্মৃতিশক্তির দরুন দুটো রিহার্সালে তোমার সংলাপ মুখস্থ হয়ে গেছে। তার প্রত্যেকটি নিচু স্বর তুলে নিচ্ছ, উঁচু স্বর চেপে দিচ্ছ। ফলে ডেলিভারির স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রত্যেকটি শব্দ সুন্দরভাবে শোনা যাবে। কিন্তু রঙ থাকবে না। একেই বলে ফ্ল্যাট্‌-কার্ভ রেকর্ডিং।'

এবার সত্যিই মনে হল কিছুই শিখিনি।

নিউ থিয়েটার্স, ক্যালকাটা মুভিটোনে আমার চলচ্চিত্র-জীবনের উদ্যোগ পর্ব। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলাম পরিচালক হব বলে, শব্দযন্ত্রী হব বলে নয়। কিন্তু বহু বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গ, শিক্ষা ও পরামর্শ পরিচালক হওয়ার পথে সাহায্য করেছিল আমাকে।

স্টুডিয়োর মধ্যে একটা নিয়মানুবর্তিতা ছিল। যেদিন শুটিং থাকত না সেদিনও আমরা যে যার মেশিন খুলে ঝাড়পোঁছ করতাম। কেউই এতটুকু সময় নষ্ট করত না। কাজ করার জন্য উপর থেকে কেউ বলতেনও না।

ভেবে নিতাম, এটা আমার কাজ, আমাকেই করতে হবে। এটা আমার করণীয়।

এই চার বছরে স্টুডিয়োর মধ্যে কাউকে কোনও দিন মদ খেতে দেখিনি। তখন বেশিরভাগ মানুষই মদ ছুঁতেন না। কোনওরকম অসভ্যতাও দেখিনি। এখন প্রশ্ন জাগে, তা হলে সে-যুগে সমাজ সিনেমাকে একটা নিচু জায়গা ভাবত কেন ?

নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেননি। তিনি একাই প্রযোজনা করেন ১৩০টি ছবি। হয়তো বা বেশি। আজ নিউ থিয়েটার্স নেই বলে কোনও দুঃখ নেই। হলিউডেও তো এম. জি. এম., ওয়ার্নার ব্রাদার্স, কলম্বিয়া, ইউনাইটেড আর্টিস্ট শুধু নামটুকু নিয়েই বেঁচে আছে। অন্য ভাবে, সে-কাহিনীও অন্য। চলচ্চিত্রে কাজ করে এইটুকু বুঝেছি, চলচ্চিত্রের কিছুই দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী হয় না। তার গাঁটছড়া বাঁধা টেকনোলজির সঙ্গে—টেকনোলজি পুরনো হলে সে পুরনো হবে, নতুন ধারায় এগোবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, চিত্রকলার সঙ্গে এইখানেই চলচ্চিত্রের মূল তফাত।

৪

লন্ডনে পৌঁছলাম ১৯৫০ সালে। কতদিন আগেকার কথা, ঠিক মনে নেই। তবে সাহেবদের দেশে তখন গ্রীষ্মকাল। তখনও জেট প্লেন আসেনি। কন্‌স্টেলেশন ফ্লাইটে দীর্ঘ, ক্লান্তিকর যাত্রা।

কলকাতা থেকেই পাইনউড স্টুডিয়োতে ঢোকার ব্যবস্থা করেছিলাম। 'দি রিভার' ছবির শব্দযন্ত্রী চার্লস পুলটনকে জানিয়েছিলাম আমার অভিপ্রায়। ওখানকার ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে আর একজনের কাছেও আমি ঋণী, তাঁর নাম জর্জ রিয়ার ডেন—জে. আর্থার র‍্যাঙ্ক অর্গানাইজেশনের ভারতবর্ষের কর্তা। লাইটহাউসের উপরে বিরাট অফিস ছিল তাঁর। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রোপাগ্যান্ডা ছবির প্রিন্ট আমাদের কলকাতার ল্যাবরেটরি ফিল্ম সার্ভিস থেকে হত। সেই সূত্রে জর্জের সঙ্গে পরিচয়। তিনি সোজা স্টুডিয়োকে আমার ব্যাপারে জানান। জে. আর্থার র‍্যাঙ্ক অর্গানাইজেশন তখন পাইনউড স্টুডিয়োর মালিক। সুতরাং অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

র‍্যাঙ্ক অর্গানাইজেশন তখন গ্রেট ব্রিটেন জুড়ে প্রায় চারশো সিনেমা হল চালাত। অধিকাংশ ব্রিটিশ ছবিরই তারা প্রযোজক। কোটি কোটি পাউন্ডের কারবার, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হলিউডের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। ফলে দেউলিয়া হয়ে যায় পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে, আমি লন্ডনে পৌঁছনোর সাত-আট বছর পরে।

লন্ডনে উঠলাম ওয়াই.এম.সি.এ.-তে। পরের দিন পাইনউড স্টুডিয়োর ম্যানেজার মিস্টার ক্রোহার্স্ট-কে টেলিফোন করি তাঁর বাড়িতে। তিনি পরের দিন সকালেই স্টুডিয়োতে দেখা করতে বললেন। সব ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন জর্জ আর পুলটনের সুপারিশের দরুন।

রাসেল স্কোয়ার টিউব স্টেশন থেকে পিকাডেলি লাইনের শেষ স্টেশন আক্সব্রীজ। সেখান থেকে বাসে মিনিট দশেকের পথ—বাস থামত একেবারে পাইনউড স্টুডিয়োর গেটে। বিশাল স্টুডিয়ো, প্রায় ৫০/৬০ একর জমি। র‍্যাঙ্ক অর্গানাইজেশনের আরও একটা স্টুডিয়ো ছিল—ডেনহ্যাম,

ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্টুডিয়ো। স্টুডিয়োর মধ্যে একটি বিশাল জঙ্গলও ছিল। সেখানে শুটিং হয় 'রবিন হুড' ছবির। আমি যখন গেছি তখন ডেনহ্যাম বন্ধ। আমাকে মিস্টার ক্রোহার্স্ট পরিচালক চার্লস ক্রাইটনের ইউনিটে ঢুকিয়ে দিলেন, পর্যবেক্ষক শব্দযন্ত্রী হিসাবে।

আমাদের সঙ্গে ওঁদের স্টুডিয়োর যন্ত্রপাতির অনেক তফাত। আধুনিক সাজসরঞ্জাম দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কত রকমের ছোট বড় ক্রেন, কত রকমের ডলি আর ক্র্যাবডলি, যা আমি আগে দেখিনি। পরিচালক যে ধরনের শট চাইতেন, তা-ই পেতেন। শব্দযন্ত্রী ফ্লোরে বসেই সাউন্ড কন্ট্রোল করে। রেকর্ডিং হয় উপরের একটি ঘরে। আমার স্থান হল শব্দযন্ত্রীর পাশে একটি চেয়ারে। সুতরাং যা চাইছিলাম তা-ই পেলাম। পেলাম একটি চিত্রনাট্যের কপি আর সব কিছু দেখার সুযোগ।

যতদূর মনে পড়ে ছবির নাম 'দি হান্টেড'। অভিনেতা তরুণ ডার্ক বোগার্ডে, পরবর্তীকালে যিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন। হলিউডের এম.জি. এম. থেকে ইতালির ভিসকন্তি, নানা পরিচালকের ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তখন একেবারে নবাগত যুবক। ছবি আঁকা ছিল তাঁর আসল নেশা, ছবিতে অভিনয় করাটা পেশা। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁর মুখে কোনওদিন আগেকার দিনের অভিনেতাদের কথা শুনিনি। শুধু চিত্রশিল্পীদের কথা। গত শতাব্দীর দেগা, ভ্যান গখ্ থেকে এই শতাব্দীর পিকাসো, ডালি সম্বন্ধে অনর্গল বলে যেতে পারতেন। তবে বেশি বলতেন না। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। প্রয়োজনও দেখিনি। তাঁর অভিনীত অনেক ছবি দেখেছি। অভিনয় যে খুব একটা ভাল লেগেছে তা নয়।

পরিচালক চার্লস ক্রাইটন সে-যুগের প্রথম সারির পরিচালকদের একজন। তাঁর হাতে কমেডি ভাল খুলত—নির্ভেজাল ব্রিটিশ কমেডি। পিটার সেলার্স-কে নিয়ে কিছু ছবি করেছিলেন। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল অ্যালেক্ গিনেস অভিনীত 'ল্যাভেন্ডার হিল মব'। মানুষ হিসাবে ছিলেন নিরহঙ্কারী, উদার। শুটিং-এর অবসরে গল্প করতেন আমার সঙ্গে। আলোচনার বিষয় ছিল ভারতবর্ষ আর ক্রিকেট। ছবির কথা কোনওদিন হয়নি। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিরাট বিরাট পরিচালকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছা করেই কোনওদিন ছবি নিয়ে আলোচনা করিনি। যা বলবার ছবির মাধ্যমেই তো বলেছেন, আবার আলোচনা কিসের ?

ইতিমধ্যে আমার থাকার জায়গার বদল হল। স্ট্যাভিস্টক্ স্কোয়ার-এ একটা জায়গা পেলাম। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা থাকে। সেই সময় জার্মানি, ইতালি আর পোল্যান্ড থেকে দলে দলে তরুণ তরুণী লন্ডনে আসত

ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য। হস্টেলে তাদেরই সংখ্যা বেশি ছিল। তাদের দেখে কীরকম হতচকিত মনে হত, বেশি কথাবার্তা বলত না, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকাত। বুঝতাম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ওদের সঙ্গে কোনওদিন যুদ্ধের কথা আলোচনা করিনি। তবে দু-একজন নিজে থেকেই কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের বিভীষিকার কথা বলত।

এই সময় একজন বিরাট সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি রেকর্ডিং করতেন না, রিসার্চ করতেন। নাম উইলিয়াম ডি-লেনলি। আমাকে হ্যামারসিথ-এর আর.সি.এ.-র 'দি টাওয়ার' বিল্ডিং-এ ডবলিউ জে ময়লেন নিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। মিস্টার ময়লেন ত্রিশ দশকে দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ মুভিটোন নিউজ এবং ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন নিউজের কর্ণধার ছিলেন। নিউ থিয়েটার্স, ইন্দ্রপুরী ফিল্ম করপোরেশনকে অনেক সাহায্য করেছেন। যেমন নিউ থিয়েটার্সের জন্য একটি উড়োজাহাজ বানিয়ে দেন। আকাশে ওড়ার জন্য নয়, প্রপেলার চালিয়ে ঝড়ের সিন তোলার জন্য। প্রপেলার-সহ ইঞ্জিন একটা শক্ত কাঠের সঙ্গে ফিট করে বহুদিন খেটে ইঞ্জিন চালু করেন। তখন কলকাতায় চার্লস কিভ নামে একজন শব্দযন্ত্রী ছিলেন। খুব গুণী মানুষ। মিস্টার ময়লেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁরা যে কোনও ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়ে কত কাণ্ড করতেন আজ তা ভাবা যায় না। বিস্কুটের টিনের মধ্যে 'ডিক্‌টোফোন', সেই সঙ্গে 'টক্‌ব্যাক'-ও করে ফেললেন।

কলকাতা শহরকে বড় ভালবেসেছিলেন মিস্টার ময়লেন। হয়তো আমার মতো একজন কলকাতাবাসীকে পেয়ে উজাড় করে স্নেহ-ভালবাসা দিয়েছিলেন। প্রায় রবিবারে স্ত্রী ও শিশুকন্যা-সহ আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন লন্ডন ছাড়িয়ে অনেক দূরে। সকলে মিলে কোথাও খেয়ে নিতাম। বড় ভাল লাগত ওঁদের সঙ্গ। বলতেন, 'এখানে এতটুকু সময় নষ্ট করবে না। যতটা পারো দেখে যাও। জানি, এরকম যন্ত্রপাতি পাওয়া কলকাতায় সম্ভব নয়—তাতে কী ? মূল কথা বা থিয়োরি তো একই।'

ডি-লেনলি ছিলেন সত্যিকারের একজন বৈজ্ঞানিক। শব্দবিজ্ঞানের গবেষক। তিনি একটি স্পিন্ডল্ তৈরি করেছিলেন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সাউন্ড ডাবিং-এর জন্য। তার পেটেন্টও করেছিলেন, নাম—ডি-লেনলি স্পিন্ডল্। জিনিসটা এরকম : মূল ছবিটা চলছে, তার নীচে সাব টাইটেলের মতো যে ভাষায় ছবিটা ডাবিং করা হবে তার সংলাপের লেখাটাও চলছে ডি-লেনলি স্পিন্ডল্-এর মাধ্যমে। পর্দায় রেডিও ব্যান্ডের মতো একটা সোজা লাঠির মতো ব্যান্ড দাঁড়িয়ে আছে। লেখাগুলো ব্যান্ডের গায়ে লাগলে যিনি ডাব করছেন তিনি কথাগুলো উচ্চারণ করলেই একেবারে মিলে যাবে।

সেই সময় 'ক্যারাভ্যান' নামে স্টুয়ার্ট গ্র্যানজার-এর একটি অপরিণত ছবি ইতালিয়ান ভাষায় ডাবিং হচ্ছিল। ডি-লেনলি-র সঙ্গে পরিচয় হল। প্রচণ্ড দাম্ভিক মানুষ। বললেন, 'শুধু আমেরিকা যেতে এক মিলিয়ন ডলার রোজগার করব ছবি ডাবিং করে।' বছর ছয়েক পর আবার লন্ডনে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। প্রকৃত বিস্ময়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাই। ইতিমধ্যে প্যানারোমিক ও স্টিরিওফোনিক সাউন্ডও করে ফেলেছেন। অর্থাৎ মূল ছবির ডাবিং-এও চরিত্র বাঁ দিক থেকে ডান দিকে কিংবা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে কথা বলতে বলতে হেঁটে গেলে শব্দও ঠিক সেইভাবে যাবে। তাঁর নিজস্ব ছোট্ট থিয়েটারে আমাকে তা দেখালেন। পাঁচটা ছোট ছোট স্পিকার সাজানো রয়েছে ফুটবল মাঠে খেলোয়াড়রা যেমন দাঁড়ায় সেইভাবে। স্ক্রিনের পিছনে গোলকিপার। সামনে ডাইনে আর বাঁয়ে আরও দুটো স্পিকার ফুটবলের রাইটব্যাক আর লেফটব্যাকের মতো। বাকি দুটো থিয়েটারের পিছন দিকে ডাইনে আর বাঁয়ে—রাইট আউট আর লেফট আউটের মতো।

আবার বছর দুয়েক পর তাঁর সঙ্গে লন্ডনে দেখা হল। উত্তেজনা হচ্ছিল, না জানি এবার গিয়ে কী দেখব। আবার হতভম্ব হলাম। সব জিনিসটাকে ছোট্ট করে একটা টেবিলের উপর অনেকটা চার্চ অর্গানের সাইজে করে ফেলেছেন। সামনে একটি চেয়ার। টেলিভিশনের মতো একটি ছোট্ট স্ক্রিন। তাতে ছবির সঙ্গে সাবটাইটেল-সংলাপ ছুটছে। অভিনেতা বা অভিনেত্রী একাই সুইচ টিপে চালাতে পারেন। কারও সাহায্যের দরকার নেই। যাঁর যখন সময়, এসে ডাবিং করে চলে যেতে পারেন। 'জিনিয়াস' কথাটা বোধহয় এই ধরনের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পরের বছর আবার লন্ডনে যাই। লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আমন্ত্রণে। শুনলাম, রিভলভারের নল কপালে ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ডি-লেনলি। অনেক কষ্টে কারণ জানার কৌতূহল দমন করলাম। প্রতিভাবান মানুষকে দূর থেকে দেখাই ভাল। কাছে গেলেই নিরাশা।

চার্লস ক্রাইটনের 'দি হান্টেড' ছবির কাজের শেষপর্ব চলছে। একদিন সকালে ডার্ক বোগার্ডে বললেন, 'আজ লাঞ্চের সময় একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব'। কথাটা বলেই মেকআপ রুমের দিকে ছুটলেন। জিজ্ঞেস করবার সময় পেলাম না যে, কে ?

যথাসময়ে ডার্ক আমাকে হাজির করলেন লরেন্স অলিভিয়ার-এর সামনে। তিনি তখন খাচ্ছিলেন। অলিভিয়ার প্রথমেই ডার্ক-এর উদ্দেশে একটি অশ্লীল শব্দ ছুঁড়ে মিষ্টি হেসে স্বাগত জানালেন আমাকে। শব্দটি আপাতভাবে অশ্লীল হলেও ওঁদের মধ্যে চালু সম্বোধন, অনেকটা আমাদের 'শালা'-র মতো।

অলিভিয়ার আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন ভারতবর্ষ, কলকাতা এবং কলকাতার নাটক সম্পর্কে। যতটা জানতাম উত্তর দিলাম। আমার কথা বলার পালা এলে বললাম, 'আপনার ছবি দেখেছি।' তিনি বললেন, 'স-ব ? বেশ, নাম বলো।' গড়গড় করে নাম বলে দিলাম। তিনি হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'তার মানে লেখাপড়া কিছু করোনি, খালি সিনেমা দেখেছ !' বলেই আবার সেই লরেন্স অলিভিয়ার-খ্যাত বিখ্যাত হাসি।

বললাম, 'দু সপ্তাহ আগে আপনার নাটকও দেখেছি, সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা।' এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন অলিভিয়ার। বললাম, 'একটা জিনিস আমার বড় অদ্ভুত লাগল। অনেকদিন আগে আপনার আর ভিভিয়ান লি-র 'লেডি হ্যামিলটন' দেখেছিলাম। তখন ভিভিয়ান তরুণী।' হেসে বললেন, 'আমিও তখন তরুণ ছিলাম।' বললাম, 'লেডি হ্যামিলটনের প্রথম দৃশ্যে ভিভিয়ান লি বৃদ্ধা। সারা অঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্ন। গলার আওয়াজ অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ভাঙা, ফ্যাসফ্যাসে। আর আজ তিনি প্রৌঢ়া। কিন্তু স্টেজে চঞ্চলা হরিণীর মতো ক্লিওপেট্রার ছুটোছুটি দেখে মনে হল বয়স আঠারোর বেশি নয়।' মুখ কিছুটা বিকৃত করে অলিভিয়ার বললেন, 'অভিনয় করতে এসেছে। শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখবে না, তা হয় নাকি !' অহীন্দ্র চৌধুরীর কথা মনে পড়ে গেল—'দেহ পট সনে নট সকলি হারায়'।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন অলিভিয়ার, 'নাটক পড়েছ ?' বললাম, 'পড়েছি। মনে হয়েছে একেবারে পাঠ্য নাটক। আপনার নাটক না দেখলে ভাবতে পারতাম না এ নাটক মঞ্চস্থ করা যায়।' খাওয়া সেরে উঠতে উঠতে তিনি বললেন, 'পাঠ্য নাটক বলে কিছু নেই। সব নাটকই মঞ্চস্থ করা যায়।' সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খেলে গেল সব কিছু নিয়ে ছবিও করা যায়।

১৯৮০-৮১ সালে লন্ডনে স্যার লরেন্সের একটা টি.ভি. ইন্টারভিউ দেখি। শীর্ণ চেহারা—গলার আওয়াজ ক্ষীণ ; দুরারোগ্য ক্যান্সার ও অন্যান্য ব্যাধিতে ভুগছেন। একজন লম্বা চুলওয়ালা তরুণ তাঁকে প্রশ্ন করছিল। 'আপনার মতন একজন বিরাট অভিনেতা এত আজেবাজে ছবিতে কাজ করেন কেন ?' মুহূর্তে তাঁর বসা চোখ দুটি হ্যামলেটের চোখের মতো জ্বলে উঠল। বললেন, 'তুমি আমার সংসার চালাবে ? আমার ছেলেমেয়ের স্কুল কলেজের খরচ দেবে ?' দিন পনেরো পরে টি.ভি.-তে অরসন ওয়েলস্-ও প্রায় অনুরূপ প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছিলেন, আরও তীক্ষ্ণ ভাষায়।

লন্ডন শহরের সারা অঙ্গে তখন বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত। তিনতলা বা চারতলা বাড়ি খুব কমই দেখা যায়। রাস্তার ধারে শতরঞ্জি টাঙিয়ে রেস্তোরাঁ। চকোলেট আর ডিম র‍্যাশন। ইংরেজ ছাড়াও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই

তপন সিংহ ও টিঙ্কু ঠাকুর—'কাবুলিওয়ালা'

ছেয়ে ফেলে শহরটাকে। কমতে থাকে গোধূলির সময়-সীমা। আমার বেশ হিংসে হত গ্রীষ্মে ওখানকার তিন-চার ঘণ্টা সন্ধ্যার কথা ভেবে। ওরা বেশ ধীরেসুস্থে এক সন্ধ্যায় একটি পুরো সিন টেক্ করতে পারত। আমরা তো মোটে সূর্যাস্তের পর পনেরো কুড়ি মিনিট গোধূলি পাই। তারপর ঘন আঁধার নেমে আসে। বড়জোর দু-একটা শট নিতে পারি। অপেক্ষা করতে হয় আবার পরের দিন সেই সময়টুকুর জন্য। সাদাকালো ছবিতে গোধূলির আলোয় অনেকরকমের এফেক্ট দেওয়া সম্ভব।

যেখানে থাকতাম সেখান থেকে লন্ডন ইউনিভার্সিটি খুব কাছে। একদিন আমার রুমমেট ফিলিপের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি। ফিলিপ তখন লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে পি. এইচ. ডি. করছে। হঠাৎ দেখি একটা পুরনো মরিস চালিয়ে এক ভদ্রলোক গাড়ি পার্ক করে নামলেন। তখন লন্ডনে নতুন গাড়ি খুব কম দেখা যেত। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হল কোথায় যেন দেখেছি। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, চোখে চশমা। আমি তো মনে মনে ফিল্ম জগতের কোনও বিখ্যাত মানুষের কথা ভাবছি। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে সামনের বাড়িতে ঢুকলেন। হাতে একটা ব্রিফকেস। ফিলিপ বলল, 'কাকে দেখছ ?' বললাম, 'উনি কে ? কোথায় যেন ওঁর ছবি দেখেছি মনে করতে পারছি না।' ফিলিপ হেসে বলল, 'টি.এস. এলিয়ট।'

চমকে উঠলাম। নোবেল প্রাইজ পাওয়া কবি নিজে একটা ঝরঝরে গাড়ি চালিয়ে এলেন। আমাদের দেশের কোনও কবি হলে তো এখুনি হাজার হাজার লোক পায়ের ধুলো নিয়ে মাতামাতি করত !

স্থির করলাম একদিন এলিয়টের অফিসে হানা দেব।

গেলামও। তাঁর সেক্রেটারিকে বললাম দেখা করতে চাই। মিষ্টি হেসে প্রৌঢ়া মহিলা ভিতরে গেলেন। দু' মিনিট পরে ডাক এল। ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে কীরকম যেন হয়ে গেলাম। প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'কলকাতা থেকে আসছি। কোনও কারণ নেই, শুধু আপনাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে দেখা করা।'

মাত্র মিনিট পাঁচেক ছিলাম। সময় নষ্ট করতে চাইনি। ওরই মধ্যে কয়েকটি কথা বলা। 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল'-এর কথা উঠতে বললেন, 'লন্ডনে ওরা স্টেজ করেছিল, একেবারে ফ্লপ। চলেইনি।' বলে হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, 'রবীন্দ্রনাথ নিউ থিয়েটার্সের 'নটীর পূজা' ছবি স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন। সাতদিনও চলেনি।' শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন।

পাইনউড স্টুডিয়োতে জ্যাক কার্ডিফ এসেছেন। নিজেই করেছেন চিত্রগ্রহণ আর পরিচালনার কাজ। পৃথিবীর বিখ্যাত ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে দুজন আমার খুব প্রিয় ছিলেন। একজন হলিউডের জেমস ওয়াংহো আর

এগিয়ে এসেছে শহরকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে। সুন্দর থেকে সুন্দরতর করতে। সে এক বিরাট কর্মকাণ্ড। এত দুঃখ, এত দৈন্যের মধ্যেও মানুষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায়নি।

স্টুডিয়ো থেকে ফেরার সময় অনেকদিন পাইনউড থেকে আক্সব্রীজ হেঁটে ফিরতাম। খুব ভাল লাগত। পথে দেখতাম এক টুকরি আপেল রাখা আছে। আর লেখা আছে, দাম এক পেনিতে একটা। বিক্রেতা নেই। একটা আপেল নিয়ে এক পেনি রেখে দিয়ে খেতে খেতে হাঁটতাম। আজকের লন্ডনে এই দৃশ্য বিরল। ইংরেজদের সেই মার্জিত ব্যবহারও আর নেই।

একদিন স্টুডিয়োতে একটা নোটিশ দেখলাম। বেলা তিনটের সময় তিনজন টেক্‌নিশিয়ান টুন্ড্রা বা ল্যাপল্যান্ড থেকে ফিরবেন। তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হবে। সাড়ে তিনটে নাগাদ একটা ভ্যান ঢুকল। তা থেকে নামল তিনটি মূর্তি। দেখে শিউরে উঠলাম। জট পাকানো চুল আর দাড়ি। নাকে মুখে ঘা, রস গড়াচ্ছে। কুষ্ঠ রোগীর মতো ক্ষত-বিক্ষত দেহ। সবাই হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল। তাঁরাও হাসিমুখে হাত নাড়লেন। তারপর তাঁদের পাঠানো হল হাসপাতালে।

দু'দিন পরে তাঁদের তোলা ছবি দেখলাম। যাকে বলে স্লেট-টু-স্লেট। মানে সম্পাদনা ছাড়া শুধু শটগুলো। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। বল্গা হরিণ আর ওখানকার অধিবাসীদের পোষা ঈগলপাখি নিয়ে একটি হিউম্যান ডকুমেন্টারি ফিল্ম। কবিতার মতো। শটগুলো যেন কবিতার এক-একটি লাইন। চামড়ার গ্লাভ্‌স পরা হাত থেকে ঈগল উড়ে যায়। ঊর্ধ্ব আকাশে বিলীন হয়ে যায় ঘুরে ঘুরে। তারপর সোঁ সোঁ আওয়াজ করে বাতাস কেটে অবিশ্বাস্য গতিতে নেমে আসে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে। ঝাঁপিয়ে পড়ে বরফের মধ্যে। শুরু হয় দাপাদাপি। তুষারকণা উড়তে থাকে। সূর্যের আলোয় মনে হয় রাশি রাশি হিরে জ্বলছে। পর মুহূর্তেই আকাশে ওঠে ঈগল। দুই পায়ে ধরা মোটা লোমশ একটি জন্তু। প্রভুর কাছে ফিরে আসে উপহার নিয়ে। এরকম কত রকমের যে ছবি আর তার সৌন্দর্য! ছুটন্ত বল্গা হরিণের দল— পায়ে পায়ে বরফ ঠিকরে পড়ে। স্তিমিত বিষাদভরা সন্ধ্যায় ওখানকার মানুষদের জীবনযাত্রা। শিশুর হাসি। বাঁশির সুর। সবটাই আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ছবি দেখার পর প্রেরণা পেলাম। স্টুডিয়ো ফ্লোরের মধ্যে চেয়ারে বসে স্টার্ট আর কাট্ বলে ছবি করা যায় না। বাইরে বেরুতে হবে সব বাধা দূর করে। বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্নভাবে প্রকৃতি আর মানুষকে ধরতে হবে। চাই ক্লান্তিহীন পরিশ্রম। অটুট স্বাস্থ্য। সতেজ মন।

সময় গড়িয়ে যায়। দেখতে দেখতে নভেম্বরের লন্ডনের বিখ্যাত ফগ

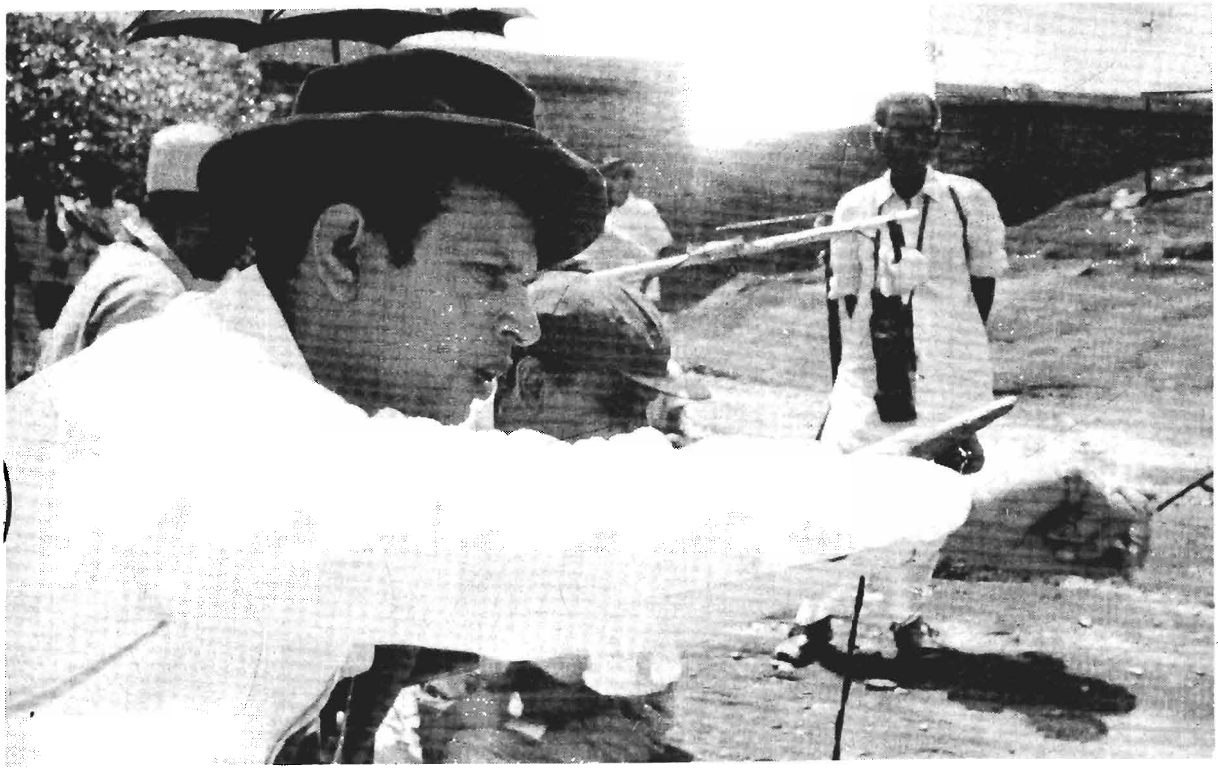

লোকেশানে পরিচালক তপন সিংহ

সায়রা বানু, দিলীপকুমার ও তপন সিংহ—'সাগিনা মাহাতো' *(ছবি : এস রায়)*

পুত্র অনিন্দ্য, অরুন্ধুতি দেবী ও তপন সিংহ—আন্দামানে সেলুলার জেলের সামনে *(ছবি : সুকুমার রায়)*

মহুয়া, অমল পালেকর ও তপন সিংহ—'আদমী ঔর আউরৎ' *(ছবি : সুকুমার রায়)*

ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তপন সিংহ

তপন সিংহ ও সত্যজিৎ রায়

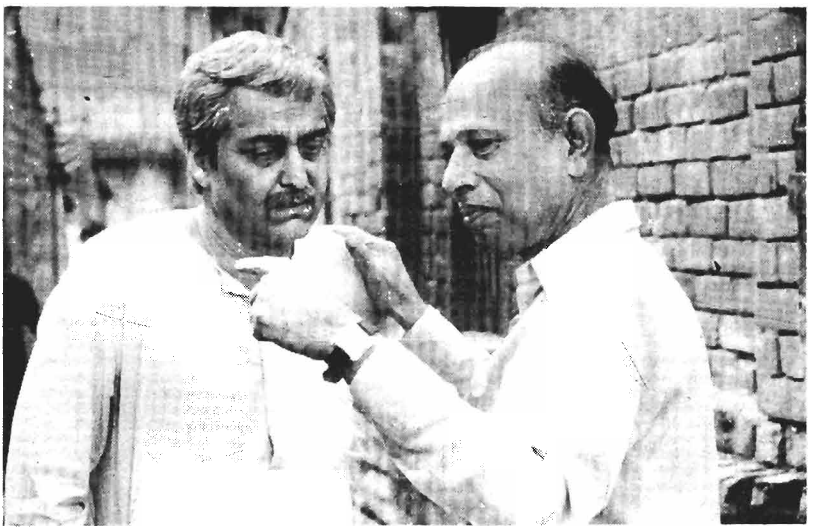

'আতঙ্ক'—তপন সিংহ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

শাবানা ও পঙ্কজ কাপূরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তপন সিংহ—'এক ডক্টর কী মৌত'

ছবি : সুকুমার রায়

তপন সিংহ ও অরুন্ধুতী দেবী—'কালামাটি' *ছবি : সুকুমার রায়*

ব্রিটেনের জ্যাক কার্ডিফ। বিশেষ করে সে-যুগের সাদাকালো ছবিতে এঁদের তুলনা পেতাম না। একটা রিল দেখেই বলে দিতে পারতাম জ্যাক কার্ডিফ বা জেমস ওয়াংহোর ছবি, যেমন এখন পারি সুব্রত মিত্রর ছবি দেখে। অবশ্য অনেকের মত অন্যরকম। আমি নিজের ধারণার কথাই বলছি।

জ্যাক কার্ডিফ একটি ফাঁসির কয়েদির কনডেম্‌ড সেল তৈরি করেছিলেন। ফাঁসি হওয়ার আগে কয়েকটি রাতের দৃশ্য। অসাধারণ লাইটিং। অজস্র লাইট ব্যবহার করেছিলেন জেমস্, ডেপথ্ অফ-ফোকাসের জন্য। তা ছাড়া অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ চোখ ধাঁধানো আলোয় কনডেম্‌ড সেল এক ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছিল। আইন অনুযায়ী ফাঁসির আগে আসামীর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য ঘরটাতে বেশি আলো থাকে। এই প্রথা যে কত নিষ্ঠুর সেটা বোঝানোর জন্য এই ধরনের লাইটিং। জ্যাক কার্ডিফের সুষমামণ্ডিত 'প্যানডোরা অ্যান্ড দ্য ফ্ল্যাইং ডাচম্যান' আমরা সবাই দেখেছি। ক্যামেরা দিয়ে যেন কাব্যের সৃষ্টি। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভাল লেগেছিল। যে কদিন কাজ করেছিলেন, অবসর সময় তাঁর সেটে থাকতাম।

বিখ্যাত পরিচালক স্যার ক্যারল রিড একদিন সেটে এলেন। তাঁর 'অড ম্যান আউট' ছবিটি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ছবির মধ্যে একটি। বারো বছর পর আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় হলিউডে। 'মিউটিনি অন দা বাউন্টি' ছবি শুরু করবেন মার্লন ব্র্যান্ডো-কে নিয়ে। পরে শুনেছিলাম তিনি ছবি ছেড়ে দিয়েছিলেন ব্র্যান্ডোর দুর্ব্যবহারে। কত রকমের ছবি করেছেন ক্যারল রিড—থার্ড ম্যান, ট্রাপিজ, আনটাচেব্‌ল ইত্যাদি। দু-চার লাইনে এত বড় প্রতিভার বর্ণনা হয় না।

লন্ডনে আসার মাসখানেকের মধ্যেই ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের সভ্য হলাম। স্টুডিয়ো থেকে সন্ধ্যায় সোজা ইন্সটিটিউটে চলে যেতাম। ১৬ মিলিমিটারে ইউরোপের ছবি দেখানো হত মাঝে মাঝে। তা ছাড়া বিখ্যাত সব ছবির স্টিল ফোটোগ্রাফ সাজানো থাকত। দেখতাম, আনন্দ পেতাম।

মনে পড়ে গেল ১৯৪৮-এ ক্যালকাটা মুভিটোনে আমাদের একটি ছোট্ট ফিল্ম ক্লাব ছিল। উদ্যোক্তা মৃণাল সেন। কোত্থেকে জানি না আইজেনস্টাইন, পুডভকিন-এর ছবি আনতেন মৃণালবাবু। আমরা সাত-আটজন মিলে দেখতাম বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। কানন দেবীও ছিলেন আমাদের মধ্যে। সব খরচ উনিই দিতেন। নামহীন গোত্রহীন ভারতবর্ষে প্রথম ফিল্ম ক্লাব বোধহয় এটিই, মৃণাল সেনের সৌজন্যে।

ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটে দিন দিন ইন্টেলেকচুয়ালদের ভিড় বাড়তে লাগল। শুধু ফর্ম নিয়ে লাফালাফি। সামান্য সাত-আটজন গভীরভাবে সিনেমাকে ভালবেসেছিলেন, তার মধ্যে স্ট্যানলি রিড একজন। 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক অবদান ছিল। তেতাল্লিশ বছর

আগেকার কথা। পরে কী হয়েছে খবর জানি না। মাঝে মাঝে লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি ষাটের দশকে। স্ট্যানলি রিড তখন ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর। খুব আদর যত্ন করতেন।

লন্ডন শহরে বসে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ছবি দেখা যায়। এ সুযোগ নিউ ইয়র্ক বা প্যারিসেও পাওয়া যায় না। সেই সময়টাও চলচ্চিত্র শিল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। পথ দেখিয়েছিলেন রোজেলিনি 'ওপেন সিটি', 'পাইজা' ইত্যাদি ছবি করে। হলিউড থেকে ইনগ্রিড বার্গম্যান-কে উড়িয়ে নিয়ে এসে তাঁর সর্বনাশও করেছিলেন। ফেলিনির 'নাইটস্ অফ ক্যারেরিয়া', ডিসিকার 'বাইসাইকেল থিফ', 'মিরাক্‌ল ইন মিলান', ইত্যাদি ছবি এক নতুন ফিল্মি দুনিয়ার সন্ধান দেয়। সেই সঙ্গে আসর আলো করে নামলেন ইঙ্গমার বার্গম্যান 'সেভেন্‌থ সিল' উপহার দিয়ে। চুপচাপ, একা একাধিকবার ছবিটা দেখতাম। ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটে সেমিনার-টেমিনার হত। আমি যেতাম না। শুকনো লেকচার শুনতে কোনওদিনই ভাল লাগত না।

পাইনউডে একদিন হলিউড থেকে জেমস স্টুয়ার্ট এলেন এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর চরিত্রে অভিনয় করতে। কী অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা। লম্বা লম্বা শট দেন, অভিনয়ের মধ্যে কত ধরনের অলঙ্কার। নিজেই বার বার নিষ্ঠার সঙ্গে রিহার্সাল করেন। যত রিহার্স করেন ততই যেন অভিনয় খুলে যায়, নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হয়। পৃথিবীর প্রথম সারির সুদক্ষ অভিনেতা জেমস্ স্টুয়ার্ট মানুষ হিসাবেও তেমনই মিষ্টভাষী, দরদী ও উদার।

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে আমার দিন কাটে। সকাল সাড়ে আটটায় ত্রিশ মাইল দূরে স্টুডিয়োতে যাওয়া, সন্ধে ছ'টায় ফিল্ম ইন্সটিটিউট। নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে হস্টেলে ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। এরই মধ্যে স্ট্যানলি ম্যাথুজের ফুটবল খেলা। সেজম্যান আর ডিক স্যাবিচের মধ্যে উইম্বলডন টেনিস ফাইনাল, লন্ডন ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা ইত্যাদি না দেখে বা না শুনে থাকা যায় নাকি ?

কুইনস্ পার্ক গোলাপে গোলাপে ছয়লাপ। দুপুরবেলা ঘাসে শুয়ে আছি চুপচাপ। হঠাৎ মনে হল এই যে এত ব্যস্ততা, এটা কিসের জন্য ? অর্থহীন এই ব্যস্ততা। অহেতুক সময় নষ্ট করছি। পাইনউড স্টুডিয়োতে ব্যাক প্রোজেকসনের বদলে প্যানক্রোমেটিক আর অর্থোক্রোমেটিক ফিল্ম দিয়ে বাইপ্যাক্ প্রসেসে যে চলমান পশ্চাৎপট আনা যায় তা কি কোনওদিন ভারতবর্ষে সম্ভব ?

দু-তিনদিন ধরে মনের সঙ্গে লড়াই চলল। স্থির করলাম কলকাতায় ফিরতে হবে। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়ার লড়াই।

৫

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন থাকতেন হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি পটলডাঙা স্ট্রিটে। একদিন গেলাম তাঁর কাছে। তাঁর ছোটগল্প 'সৈনিক' অবলম্বনে আমার প্রথম ছবি করবার কথা ভেবেছিলাম। নারায়ণবাবু একজন অমায়িক, উদার এবং সত্যিকারের বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে মার্জিত ভাষায় কথা বলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। 'সৈনিক' সম্পর্কে আমার ইচ্ছার কথা শুনে প্রথমটায় অবাক হয়ে গেলেন। তারপর খুশি হয়ে বললেন, 'এই তো চাই ! আপনাদের মতো তরুণরাই এইসব গল্প ভাববেন।' আমার বেশ মনে আছে দক্ষিণার কথা তুলতে তিনি বলেছিলেন, 'কিছু চাই না। আপনার সাহসই আমার দক্ষিণা।' অভিভূত হয়েও বললাম, 'তা হয় না। সামান্য কিছু আপনাকে নিতেই হবে।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে যেতে খুব ভাল লাগত। বিশেক করে 'ভারতী' যুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। অনেক অজানা কথা জেনেছিলাম। যখনকার কথা বলছি, সেইসময় রামমোহন রায়কে নিয়ে একটি নাটক লেখার পরিকল্পনা করছিলেন তিনি। রামমোহনের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং মৌলিক। শুধু রামমোহন সম্পর্কেই নয়, বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও নারায়ণবাবুর সঙ্গে আলোচনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। এঁদের সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই কৌতূহল ছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কৌতূহল সুস্পষ্ট ধারণায় পরিণত হয়। এই ধারণা থেকেই মানুষের একক সংগ্রামের সার্থকতায় আমার বিশ্বাস জন্মায়। পরবর্তীকালে আমার অনেক ছবিতে এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যি বলতে, গোষ্ঠীবদ্ধ লড়াইয়ের প্রতি আমার কোনও দিনও আস্থা ছিল না ; আজও নেই। এই লড়াই হয়তো সহজে জেতা যায়, কিন্তু পরে মানুষে মানুষে মতান্তর হয়, মতান্তর পরিণত হয় কলহে। ফলে লড়াইয়ের অন্তর্নিহিত আদর্শবোধও হারিয়ে যায়। দেশে কিংবা বিদেশে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়। অনেকে হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন না, পাল্টা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেখাবেন ; তাতে

ব্যক্তির গরিমা, সাহস, সততা সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টাবে না।

যাই হোক, ছবি শুরু করলাম 'অঙ্কুশ' নাম দিয়ে। বাংলা ও হিন্দিতে, একসঙ্গে ডাব্‌ল ভারসান।

ঠিক এই সময় একদিন বংশীচন্দ্র গুপ্ত এসে বলল, 'মানিক তোমাকে একবার ডেকেছে।' বললাম 'মানিক, মানে অসিত সেন?' বংশীর উত্তর, 'না। সত্যজিৎ রায়।'

কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনেছিলাম। ভাবলাম, ইনি আবার আমাকে ডাকছেন কেন? পরিচয় হওয়া দূরের কথা, ভদ্রলোককে কোনওদিন চোখেও দেখিনি। গিয়ে দেখি, ও হরি, এ তো সেই ভদ্রলোক—মেট্রো, লাইট হাউসের সিনেমা টিকিটের লাইনে যাঁকে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি! উচ্চতা যে-কারও চেয়ে এক হাত লম্বা, খোদাই করা মুখ, মায়াময় আয়ত দুটি চোখ।

পরিচয়ের পর সত্যজিৎবাবু কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'পথের পাঁচালী ছবি করব। সবটাই আউটডোরে—সাউন্ডের ব্যাপারটা কী করা যায় বলুন তো?' তারপর, 'আচ্ছা এক কাজ করা যাক, আপনার সময় আছে?' বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'স্ক্রিপ্‌ট্‌টা শুনবেন? তাহলে হয়তো আপনার বোঝার সুবিধে হবে।' সানন্দে রাজি হলাম। সত্যজিৎ রায়ের মুখে 'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্য শুনতে শুনতে কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, খেয়াল করিনি। এর আগে দেশ-বিদেশের বহু স্ক্রিপ্‌ট্‌ আমি পড়েছি, কিন্তু এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। ঘণ্টা দুয়েক ধরে স্ক্রিপ্‌ট্‌ শোনানোর পর বললেন, 'বলুন, সাউণ্ড নিয়ে কী করা যায়?' বললাম, 'দূর! স্ক্রিপ্‌ট্‌ শুনে সাউণ্ড-টাউণ্ড কোথায় উড়ে গেছে, ভাবছি কী করে এমন কাজ করলেন!' হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'আপনার ভাল লেগেছে?' সংক্ষেপে বললাম, 'অসাধারণ!' সত্যজিৎ বললেন, 'আমার ইউনিটের বাইরে আপনাকেই প্রথম শোনালাম।' আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, এককাপ কফি খেয়ে চলে এসেছিলাম সেদিন। সাউন্ড নিয়ে আলোচনা আর করা হল না।

এমনই অদৃষ্ট, আমার 'অঙ্কুশ' আর সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' একই ডিস্ট্রিবিউটারের হাতে পড়ল; নাম রাণা দত্ত ডিস্ট্রিবিউটার। 'অঙ্কুশ'-ও আউটডোরপ্রধান ছবি। ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরিতে একটা 'ভিন্টেন' ক্যামেরা ছিল, খুব সুন্দর ক্যামেরা। তাই নিয়ে শুরু করলাম কাজ। বাংলা ভারসান কোনওরকমে শেষ হলেও হিন্দিটা আর হল না। যথা সময়ে উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা-তে মুক্তিও পেল ছবি। চলেছিল মাত্র নয় দিন। পরিচালক হিসাবে ফ্লপ্‌ ছবির ইতিহাসে আমিই বোধহয় প্রথম হয়েছিলাম। রানা দত্ত কোম্পানির দেনা শোধ করতে ছয়-সাত বছর লেগেছিল।

সত্যজিৎবাবু অবশ্য আগেই ওই কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় 'পথের পাঁচালী'র কাজ শেষ করেন। তারপরের ইতিহাস কে না জানে !

যতদূর মনে পড়ে, কয়লাখনির আশপাশের ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পরে নিউ থিয়েটার্সে চিত্রনাট্য লিখতেন। আর একজন দিকপাল সমালোচক ও সাহিত্যিক নিউ থিয়েটার্সের চিত্রনাট্য এবং গানও রচনা করতেন, নাম সজনীকান্ত দাস। শৈলজানন্দ, অনেক 'হিট' ছবি পরিচালনা করেন। 'অঙ্কুশ' মার খাবার পর শৈলজানন্দের 'কৃষ্ণা' নামের গল্প নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা করলাম। তখন আমার ঝুলি শূন্য বলা ভাল, টাকার বদলে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, অসম্মান, অপমানের আবর্জনায় ঝুলি ভরে উঠেছে। ঠিক এই সময়ে কোয়েম্বাটোরের নব-নির্মিত 'নারাসু' স্টুডিও থেকে মোটা মাইনের শব্দযন্ত্রীর কাজ পেলাম। টাকার দরকার ছিল, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করব। দু-তিন দিন মনের সঙ্গে লড়াই চলল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম হাজার লাঞ্ছনা সহ্য করেও ছবি আমাকে করতেই হবে। এবং 'কৃষ্ণা' অবলম্বনেই করব। গল্পের রাইট কিনতে শৈলজানন্দের শরণাপন্ন হলাম। শৈলজাবাবু তখন সিনেমালাইন গুলে খেয়েছেন। বললেন, 'গল্প যার তাকে কিছু দেবে তো ?' বললাম, 'নিশ্চয়ই, তবে এককালীন দেওয়া সম্ভব নয়। এখন কিছুটা দেব, বাকিটা ছবির ডিস্ট্রিবিউশন হলে দেব।' তিনি রাজি হয়েছিলেন।

ছবি শুরু হল 'উপহার' নাম দিয়ে। উত্তমকুমার তখন সবে নাম করেছেন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, নির্মলকুমার, মঞ্জু দে ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবি শেষ হল, যথাসময়ে রিলিজও করল। মোটামুটি একটা ব্যাপার হয়েছিল আর কি। তবে পরের ছবির কথাও ভাবতে শুরু করলাম।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি নাটক পড়েছিলাম, নাম 'টনসিল'। 'বরযাত্রী'-র সেই বিখ্যাত গন্‌শা, ত্রিলোচন, ঘোত্‌নাদের নিয়ে নির্ভেজাল আনন্দের নাটক। তখন আমার একমাত্র লক্ষ্য যে করেই হোক ছবি বাজারে লাগাতে হবে। ভাবলাম 'টনসিল'-ই করি।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় থাকতেন দ্বারভাঙ্গায়। 'জয় মা' বলে একটা পোস্টকার্ড ছাড়লাম। জবাবে তিনি দ্বারভাঙ্গায় যেতে বললেন। চিত্রনাট্য তৈরি করে রওনা হলাম আমি।

কত বড় সাহিত্যিকের কাছে যাচ্ছি। ততদিনে বিভূতিবাবুর সব লেখাই পড়ে ফেলেছি। বিশেষ করে 'রানুর প্রথম ভাগ' আর 'নীলাঙ্গুরীয়' গাঁথা হয়ে গিয়েছিল মনে। কিন্তু এই যে যাচ্ছি, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার তো নয়, ওঁর গল্পের রাইট কিনতে যাচ্ছি। কাজেই বেশ ভয় করতে লাগল—যদি

পত্রপাঠ বিদায় করে দেন ! কিন্তু, আমার ধারণা ভুল হয়েছিল। দ্বারভাঙ্গা স্টেশনে নামতেই দেখি স্বয়ং বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে। আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বড় লজ্জা লাগল।

বিভূতিবাবু বললেন, 'ট্রেনে দ্বারভাঙ্গা আসা বড় ক্লান্তিকর। কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?' মুখে বললাম, 'না, কোনও অসুবিধে হয়নি,' যদিও বিস্তর অসুবিধে হয়েছিল। 'অঙ্কুশ'-এর মারের ঘা তখনও শুকোয়নি। সুতরাং ট্রেনে ভিড়ে-ঠাসা থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

বাইরের বাড়িতে একা থাকতেন বিভূতিভূষণ। ডাকবাংলো ধরনের একটি ছোট্ট বাংলো। তার তিন পাশে পুকুর কাটা, সেখানে আবার লাল শালুক উঁকি মারছে। রুক্ষ বিহারে বাংলার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস। তাঁর আতিথেয়তায় প্রথমেই শুরু হল খাওয়ানোর ধুম। আমি কোনওদিনই খাইয়ে নই। সুতরাং জলখাবারের আয়োজন দেখে মাথা ঘুরে গেল। অসহায় ভাবে তাঁর দিকে তাকাতে বললেন, 'খান, খান। সব বাড়ির তৈরি। আপনার চেহারা দেখে তো পেটরোগা বাঙালি বলে মনে হয় না।' এড়ানোর চেষ্টায় স্ক্রিপ্ট্ কখন শুনবেন বলাতে বললেন, 'হবে হবে। এত ব্যস্ত কেন ?'

দুপুরে আবার বিরাট খাবার আয়োজন, এবার ভেতর-বাড়িতে। আসন পেতে তিনিও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। এলাহি আয়োজন। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'অসম্ভব !' অর্ধেক খাবার তুলে নিতে অনুরোধ করলাম। তবুও যা খেতে হল তাতেই আইঢাই অবস্থা।

বেলা দুটো নাগাদ বসা হল স্ক্রিপ্ট্ নিয়ে। খানিকক্ষণ পড়ার পর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি। এই স্ক্রিপ্ট্ই যখন স্টুডিয়োতে ভানু, জহর, অনুপদের শুনিয়েছিলাম, ওরা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। হাউসে রিলিজ হওয়ার পর দর্শকরাও হেসেছিলেন দমফাটা হাসি। চলচ্চিত্র সমালোচক পঙ্কজ দত্ত 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছিলেন, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়, এমনই নির্ভেজাল হাসির ছবি। কিন্তু, বিভূতিভূষণের মুখে হাসি নেই। গম্ভীর মুখে স্ক্রিপ্ট্ শুনে চলেছেন। ভাবলাম, গেলাম ! নিশ্চয়ই গল্পের রাইট দেবেন না ! তখন হঠাৎ একটি শিশু এসে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'দাদু, একটা বেলুন দাও।' বিভূতিবাবু উঠতে উঠতে বললেন, 'আর পারি না। সকাল থেকে চারটে বেলুন ফাটালে !' শিশুটিকে বেলুন দিয়ে আমাকে বললেন, 'এর মাকে আপনি চেনেন।' আমি একটু অবাকই হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কি ভাগলপুরে থাকেন ?' বিভূতিভূষণ হেসে বললেন, 'না। ওর মায়ের নাম রানু।' বললাম, 'আমি কেন ? রানু প্রত্যেকটি বাঙালির অতি আদরের। কিন্তু তাঁর মেজকা হাসির স্ক্রিপ্ট্ শুনে একবারও হাসছেন না, ব্যাপারটা কি ?' এবার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে

বিভূতিবাবু বললেন, 'বেশ ভাল লাগছে। পড়ুন।'

টাকা পয়সা বিষয়ে কোনও চাহিদা ছিল না তাঁর। যা দিলাম তা অতি সামান্য। কিন্তু তাঁর একদিনের সান্নিধ্যে আমি যা পেলাম তা অনেক। সঙ্গে করে দ্বারভাঙ্গা শহর দেখালেন। রাজার বাড়ি, রাজার ছোট ভাইয়ের বাড়ি। আর কত যে যত্ন! তাঁর আন্তরিকতা, স্নেহ, আতিথেয়তা কোনওদিন ভুলতে পারব না।

'টনসিল' ছবি করার সময় এক ধূমকেতুর সঙ্গে পরিচয় হয়। এই ধূমকেতুটির নাম গৌরকিশোর ঘোষ। আজ প্রায় চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব আমাদের, গৌর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে মনে হবে অতিরঞ্জিত করছি। তবুও বলি, গৌরকিশোর ঘোষ এক বিরল মানুষ, বিরল শিল্পী, বিরল বন্ধু।

মানুষের ভালবাসা, স্নেহ, বন্ধুতা পেতে পেতে এগিয়ে চলেছি। ছবি করছি। সিনেমাজগতে কিছুটা পরিচিতিও পেয়েছি ততদিনে। আমার 'কাবুলিওয়ালা' নিয়ে তখন হইচই পড়ে গেছে সারা ভারতে। যে সব জায়গায় (যেমন বম্বে, পুনা, দিল্লি, মাদ্রাজ) বাংলা ছবি কোনওদিন স্থানীয় ছবির মতো মুক্তি পায়নি, 'কাবুলিওয়ালা' সেখানেও তুলকালাম লাগিয়ে দিয়েছিল।

তা হলে হবে কি, সেই সময়েই একদিন হঠাৎ সত্যজিৎবাবুর টেলিফোন, 'নিজে একজন টেকনিশিয়ান হয়ে এত খারাপ টেকনিক্যাল কাজ করলেন কি করে?' ছবি করার সময়ে আমার অসহায়তার কথা কিছু বললাম না তাঁকে। অপরাধ স্বীকার করে নিলাম। তিনি বললেন, 'এত ভালমানুষ সাজবার দরকার নেই। কাজের সময় কোনও কমপ্রোমাইজ করবেন না।' কাকে বলা! চিরকালই আমাকে কমপ্রোমাইজ করে চলতে হয়েছে।

খবর পেলাম 'অতিথি' ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে। আবার সত্যজিৎবাবুর টেলিফোন, 'শুনুন, রাশি রাশি নৌকোর মধ্যে তারাপদ ঝাঁপিয়ে পড়ল—এখানেই ভেনিসের জন্য ছবি শেষ করুন। পরে ওসব মা-ফা বাদ দিন। আর ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে রবীন্দ্রনাথের গান বাজাবার কি দরকার ছিল! ওটা কলকাতার জন্যে ঠিক আছে, বিদেশে কেউ বুঝবে না। মিউজিক নিজে কম্পোজ করলেন না কেন?' সত্যজিতের কথা মতো ভেনিসের জন্য ওই জায়গাতেই ছবি শেষ করি। তাতে ফল ভালই হয়েছিল।

সত্যজিৎ রায় বড় মজার মানুষ ছিলেন। প্রথম দিকে প্রায় বিশ বছর স্টুডিয়োতে আসতেন। সব সময়েই কাজ নিয়ে। হয়তো আমি গান রেকর্ডিং করছি, উনি হাঁটতে হাঁটতে বলে গেলেন, 'কি—সুর ভাঁজছেন?' এইরকম আর কি, ব্যস্ত, কিন্তু সহৃদয়।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে বি.এম.পি.এ. একটি বিরাট অনুষ্ঠানের

আয়োজন করে। বাঙ্গালোর থেকে দেবীকা রানি আসেন প্রধান অতিথি হিসাবে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন সভাপতি। ডাঃ রায় বক্তৃতার সময় উল্টোপাল্টা নাম বলতেন। সেদিন বলেছিলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারকে কতবার বলেছি যে বাংলা ছবির জন্যে কিছু টাকা দাও, আমাদের তরুণ পরিচালকেরা ভাল ভাল কাজ করছে। তা ওরা শোনেনি। এখন সত্যজিৎ যখন 'কাবুলিওয়ালা' করল আর তপন 'পথের পাঁচালী' করে নানা পুরস্কার পেল তখন আশা করি ওদের টনক নড়বে।' ওই বক্তৃতার সময় সত্যজিৎবাবু আমার পাশেই বসেছিলেন। ডাঃ রায়ের কথা শুনে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, 'পথের পাঁচালী করার জন্য আমার অভিনন্দন জানাই।'

ধীরে ধীরে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার একটা নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তাঁর বাড়িতে বেশি যাওয়া সম্ভব হত না, টেলিফোনের মাধ্যমেই যোগাযোগ হত। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্প অবলম্বনে তাঁর 'মহানগর' ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল এ যেন পৃথিবীর সমস্ত মধ্যবিত্তের কাহিনী, শুধু পোশাক আর ভাষা আলাদা। তারপর এল 'চারুলতা'। টেলিফোনে বললাম, 'চারুলতা একেবারে ওভার বাউণ্ডারি। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, মহানগর-এ যে ছ'টি বলে ছ'টি বাউণ্ডারি করেছেন তা কেউ মনে রাখবে না।' আমার কথা শুনে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে খুব হাসতে লাগলেন তিনি। অনেক বছর পরে একবার দিল্লি থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কলকাতা ফিরছি দুজনে। প্লেন একঘণ্টা লেট ছিল। দুজনে বসে চুপচাপ বই পড়ছি, হঠাৎ বললেন সত্যজিৎবাবু, 'জানেন, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। সবাই 'চারুলতা'র কথা বলে, 'মহানগর' বোধ হয় হারিয়েই গেল।' বললাম 'না, হারায়নি। আপনার কোনও কাজ হারাবে না।'

একদিন স্টুডিয়োতে সত্যজিৎবাবু আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, আমি তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিলাম, 'এই যে, সব্যসাচী বাবু! এক পেগ কফি চলবে?' উনি আমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'মানে?' বললাম, 'আপনার ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় সমান দখল।' বললেন, 'স্টেটস্‌ম্যানের লেখাটা পড়েছেন বুঝি?' বললাম, 'দারুণ লেখা।' একটু অন্যমনস্ক হয়ে তিনি বললেন, 'ছবি নিয়ে একটা বড় লেখার ইচ্ছে আছে। সময় পাচ্ছি না। দেখি।'

একবার দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কলকাতা থেকে সত্যজিৎবাবু, আমি আর অরুন্ধতী দেবী গিয়েছিলাম। শারীরিক কারণে বিজয়াদি (বিজয়া রায়) যেতে পারেননি। তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন ইন্দ্রকুমার গুজরাল। ফেস্টিভ্যালও এখনকার মতো এমন বিরাট

আকারে হত না। মন্ত্রীর পার্টিতে সত্যজিৎবাবু, অরুন্ধতী দেবী, রাজকাপুর, নার্গিস, শিবাজী গণেশন প্রভৃতি অনেকেই বসে আছেন। আমি কিছু বিদেশি মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। হঠাৎ সত্যজিৎবাবু আমাকে শুনিয়ে বাংলায় বলে উঠলেন, 'অরুন্ধতী, তুমি কিছু বলো ! তপন একডজন মেয়ে নিয়ে করছে কি ?' আমিও বাংলায় উত্তর দিলাম, 'আপনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক। সেখানে তো পৌঁছতে পারব না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বন্ধু হতে ক্ষতি কি ?' ওঁর উত্তর, 'ন্যাকামো !' রাজ, নার্গিস, অরুন্ধতী সবাই হেসে উঠল।

সত্যজিৎবাবুর বিরাট দেহ ও গম্ভীর গলার আওয়াজের আড়ালে একটি শিশু বাস করত। তাঁর রাগ, অভিমান, হাসির আড়ালে সবসময় সেই শিশুটিকে দেখতে পেতাম।

'অতিথি' ছবি শেষ করে দার্জিলিঙে প্রযোজক এস.এন. সরকার আর মীরা সরকারের আতিথ্য নিয়েছি। সরকারদের বাড়ি 'পিকো টিপ' অত্যন্ত সুন্দর। পাশেই উইণ্ডার মেয়ার হোটেলে উঠেছেন সত্যজিৎবাবু, কিন্তু দেখা হচ্ছে না। বিজয়াদি বললেন, 'মাত্র একবার হোটেল থেকে বের হয়। সিগারেট কিনতে। ঘরে বসে 'নায়ক'-এর স্ক্রিপ্ট্ করছে।'

আমরা একদিন খেতে ডাকলাম। এলেন। খানিকক্ষণ তাস পেটা হল। যাবার সময় বললেন, আজ 'নায়ক'-এর স্ক্রিপ্ট্ শেষ করব। কাল সকালে একবার শুনবেন ? অরুন্ধতী, তুমিও এসো না ?'

দুজনেই গেলাম। ঝাড়া চারঘণ্টা চিত্রনাট্য শুনলাম। চমকিত হওয়ার মতো অভিজ্ঞতা। বললেন, 'এ ছবিতে উত্তমকে নেব ভাবছি, ঠিক হবে না ?' বললাম, 'উত্তম ছাড়া এ চরিত্র হয় না।'

দার্জিলিঙে থাকাকালীন একদিন ভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘা আত্মপ্রকাশ করেছিল। দুপুরে বিজয়াদি বললেন, 'ও তো ভোর থেকে হাঁকডাক শুরু করেছে। আ-রে তপনকে ডেকে খবর দাও। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে—ও হয়তো ঘুম মারছে।' এইরকম। সব সময় সব ব্যাপারে যে তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছি তা নয়। আমার মতও অকপটে প্রকাশ করেছি। সত্যজিৎ তাতে খুশিই হয়েছেন এই ভেবে যে আমি স্তাবকের দলে পড়ি না।

বার্লিন ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত হল 'কাবুলিওয়ালা'। আমি, ছবি বিশ্বাস ও প্রযোজক অসিত চৌধুরী গেলাম সেখানে। দুদিন পরে হঠাৎ অরুন্ধতী মুখার্জি এলেন। কোন সুবাদে জানি না, কারণ 'কাবুলিওয়ালা' ছবির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। শুনলাম কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে আমাদের ডেলিগেশনের একজন করে পাঠিয়েছেন।

'কাবুলিওয়ালা' টেকনিক্যালি খারাপ হলেও সমাদৃত হয়েছিল বার্লিনে।

রবিশঙ্কর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের সম্মান পেলেন। ছবি বিশ্বাস পেলেন বিরাট সংবর্ধনা।

ছবিদার দাপটও কম ছিল না। ফেস্টিভ্যালের আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে একজন ছবিদাকে প্রশ্ন করলেন, 'পৃথিবীর কোন অভিনেতার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেন?' ছবিদার উত্তর, 'হু এল্‌স্‌ দ্যান ব্যারি মোরস্‌?' মানে শুধু জন ব্যারিমুর নয়, লায়োনেল ব্যারিমুরও। ছবিতে কাবুলিওয়ালার দাড়ি খুব খারাপ হয়েছিল। কারণ ছবিদা স্পিরিটগাম লাগাতে চাইতেন না। তাই ভেস্‌লিন দিয়ে দাড়ি লাগানো হত। ফলে, খুব বিশ্রী লাগত। তবুও 'দ্য টাইম্‌স্‌'-এর চিত্র-সমালোচক লিখলেন, 'হি ইজ সো গুড দ্যাট হিঁ মেকস্‌ ইউ ফরগেট অ্যাবাউট হিজ বিয়ার্ড।'

রাজকাপুরও সেইসময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তো আমাকে প্রচণ্ড গালাগালি দিয়ে বললেন, 'টেকনিক্যালি ভাল করলে এ ছবি একেবারে 'গোল্ডেন বিয়ার' নিয়ে যেত, কেউ ঠেকাতে পারত না।' রাজ বড় উদার অন্তঃকরণের মানুষ ছিলেন, সিনেমাই ছিল তাঁর জীবনের সব থেকে প্রিয়, তাঁর ধ্যানজ্ঞান। টাকা-পয়সা গ্রাহ্য করতেন না। যা রোজগার করতেন সবই খরচ করতেন ছবির জন্য। মনে হয় নিজের সঞ্চয় বলে তাঁর কিছুই ছিল না।

৬

বার্লিন শহরের চৌরঙ্গির নাম 'কুর ফুর্‌স্টডাম,' সংক্ষেপে 'কুডাম'। সেই রাস্তা ধরে একটু উত্তর দিকে গেলেই একটা পার্ক। এক দীর্ঘ ও নির্জন সন্ধ্যায় অরুন্ধতী মুখার্জি আর আমি বসেছিলাম পার্কে। তাঁকে একটা গান গাইতে অনুরোধ করলাম। অরুন্ধতী গাইলেন, 'পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে'।

যে-প্রসঙ্গ একান্তভাবে ব্যক্তিগত এই স্মৃতিচারণায় তার উল্লেখ করব না ভেবেছিলাম। তবু, সংক্ষেপে বলি, বার্লিনের সেই সন্ধ্যায় এক গানেই মাত করেছিলেন অরুন্ধতী। আমিও কাত হয়ে গেলাম, পরের ইতিহাসে শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জি হলেন শ্রীমতী অরুন্ধতী সিংহ।

অরুন্ধতীর রূপ ছিল সর্বজনবিদিত। নানা গুণের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। রূপের মতোই তাঁর মেজাজ। সকলের সঙ্গে মেশা তাঁর ধাতে সইত না। বন্ধুবান্ধবদের বলতেন, 'বাইরে গিয়ে আর্টের খেলা পরে দেখিও। আগে নিজের ঘরে বসে শেখ। লিভিং ইজ অ্যান আর্ট।' সত্যভাষণ পছন্দ করতেন। সত্যি বলতে, সত্যকে এভাবে আঁকড়ে থাকতে আমি খুব কম জনকেই দেখেছি। সঙ্গে ছিল মিথ্যার প্রতি ঘৃণা। যে-কারণে চিত্রজগতে তাঁর প্রাপ্য সমাদরের অনেকটাই পাননি। কিন্তু বাইরে সম্মান পেয়েছেন প্রচুর। সে-সম্মানে তাঁর অধিকারও ছিল—স্বভাবসিদ্ধ আভিজাত্যের জন্য, নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করার জন্য।

যাঁদের বিশেষ পছন্দ করতেন তাঁদের অন্যতম আমাদের প্রতিবেশিনী সঙ্গীত শিল্পী মুকুল মুখার্জি। আর ছিল তাঁর দুই প্রিয় বন্ধু—একজন এলগিন রোডের জাহাজ বাড়ির শ্রীমতী কল্পনা সেন, অন্যজন এলগিন রোডেরই সরকার বাড়ির শ্রীমতী মীরা সরকার। টানা দশ বছর ধরে প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় আমরা এঁদের সঙ্গে কাটিয়েছি। আজ অরুন্ধতী নেই, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে ছেদ পড়েনি। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও রবীন্দ্র সাহিত্য এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ছিল অরুন্ধতীর। স্মরণশক্তিও ছিল প্রখর। একনাগাড়ে শ'পাঁচেক রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বলে দিতে

পারতেন। বেড়াতেও ভালবাসতেন। তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে আর ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছি। বিভিন্ন দেশের আর্ট গ্যালারির প্রতিও ছিল তাঁর অকৃত্রিম আকর্ষণ। কিশোরী বয়সে তাঁর গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এটা ছিল তাঁর একান্ত গর্ব।

আমাদের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে অরুন্ধতীর পছন্দ ছিল সন্তোষকুমার ঘোষ আর গৌরকিশোর ঘোষকে। মানুষ গৌরকিশোরকে ভালবাসতেন খুব।

তখন ইন্দিরা গান্ধীর এমারজেন্সি চলছে। একদিন খুব ভোরবেলায় কানে এল আমাদের বাড়ির গেটের সামনে কেউ পিঁ-পিঁ করে ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে। গেট খুলে দেখি সন্তোষকুমার ঘোষ। উদ্‌ভ্রান্ত, বেশ চঞ্চল, উসকোখুসকো চেহারা। বললেন, 'আজ ভোর রাতে পুলিশ গৌরকে ধরে নিয়ে গেছে।' আরও বললেন, 'জানেন গৌরের শরীর খুব খারাপ। জেলে ও বাঁচবে না। হার্টের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।' আমি তো হতবাক। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সন্তোষবাবু বললেন, 'গৌর চলে গেলে আমাদের পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে যাবে।'

উপরে গিয়ে অরুন্ধতীকে খবর দিলাম। শুনে মর্মাহত হলেন। কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে গৌরকিশোরের একখানা পোস্টকার্ড এল, ভালই আছে। শুধু রাতে একটু কষ্ট হয় ঠাণ্ডায়। কারণ উত্তর দিকের একটি মাত্র জানলা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা আসে। অরুন্ধতী সঙ্গে সঙ্গে আলমারি খুলে আমার একটা পুরনো গরম শোওয়ার পোশাক বের করে সুন্দর ভাবে প্যাক করে, আমাকে বললেন, 'এক্ষুনি প্রেসিডেন্সি জেলে দিয়ে এস।' আমি মৃদু আপত্তি করলাম, 'যদি না দিতে দেয়, অসম্মানিত হব।' আপত্তি টিকলো না।

প্রেসিডেন্সি জেলের গেটের সামনে দাঁড়ালাম। একজন বাঙালি কনস্টেবল এগিয়ে এল। তার হাতে প্যাকেটটা দিয়ে বললাম, 'এটা গৌরকিশোর ঘোষকে দেওয়া যাবে কি?' প্যাকেটে কী আছে তাও বললাম। কনস্টেবল একগাল হেসে বলল, 'একটু দাঁড়ান স্যার, সাহেবকে ডাকি।' জেলর এলেন। খাতির করে বললেন, 'ভেতরে আসুন না?' বললাম, 'দরকার নেই। কেমন আছেন গৌরবাবু?' জেলর বললেন, 'জমিয়ে আছেন। চিন্তার কিছু নেই। প্যাকেটটা আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসছি।'

বাড়ি ফিরে অরুন্ধতীকে বললাম, 'শুধু শুধু ভেব না। ও ছেলে জেলে মরবার নয়। দেখো গিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলকে আনন্দবাজার পত্রিকার

অফিস করে বসে আছে।'

কোনও কোনও সন্ধ্যায় নিউ আলিপুরে অরুন্ধতীর বাড়ির বিরাট ছাদে আমাদের আড্ডা বসত। সন্তোষবাবু, গৌরকিশোর, আমি আর অরুন্ধতী। সন্তোষবাবু একটার পর একটা গানের ফরমাশ করতেন। তখন বিশেষ চর্চা না থাকলেও মোটামুটি ভালই গাইতেন অরুন্ধতী। তারপর শুরু হত সন্তোষবাবুর গানের বিশ্লেষণ—ভাব, শব্দ চয়ন, সুর ইত্যাদি নিয়ে কোনওরকম জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা নয়, এ যেন আন্তরিক অনুভূতির শ্রদ্ধা বিজড়িত অভিব্যক্তি।

এমনিতেই সন্তোষবাবুর কথার স্পিড ছিল মিনিটে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি শব্দ। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে সেই স্পিড দাঁড়াত মিনিটে সত্তর থেকে আশিটি শব্দ। মাঝে মাঝে গৌরকিশোর ফোড়ন কাটত, 'এই রবীন্দ্রনাথই আপনাদের দুজনের মাথা খেয়েছে।' সন্তোষবাবু রেগে আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'এই মূর্খটিকে এত ভালবাসেন কি করে বুঝি না!' গৌর মাথা নিচু করে থাকত। সন্তোষবাবুর দৌলতে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে পেয়েছি। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

গৌরকিশোর মাঝে মাঝে ফোনে বলত, 'অমুক বইটা কিনে পড়ে ফেল।' কোনও বিদেশি লেখকের বই—কিনতাম, পড়তাম, ভাল লাগত। সঙ্গে সঙ্গে চালান করে দিতাম সন্তোষবাবুর কাছে। তাঁর উৎসাহ ছিল দেখবার মতো। মনে আছে, সলঝেনেত্‌সিনের 'ফার্স্ট সার্কল' কলকাতায় আসেনি তখনও, গৌরকিশোর দিল্লি থেকে কিনে দিয়ে গেল। পড়ে স্তম্ভিত হলাম। ঠিক করে ছিলাম সলঝেনেত্‌সিনের সব লেখা পড়ব। সেই সময় বম্বেতে দুটি ছবি করি। বম্বের কাজে বিশেষ ভাবনা চিন্তার দরকার হত না, পরিচালকের ভাবনা নায়ক নায়িকারাই ভেবে দিত, সুতরাং হাতে প্রচুর সময়। একটা বইয়ের দোকানে সলঝেনেত্‌সিনের যত বই পাওয়া যায় একে একে পাঠাতে বললাম। হোটেলে পাঠিয়ে দিত। পড়তাম।

এই রুশ লেখকের একটি বড় গল্প 'ওয়ান ডে ইন্ দ্য লাইফ অফ আইভান দেনিসোভিচ্' নিয়ে ছবি করা হয় ইংল্যাণ্ডে। তার ছাপা চিত্রনাট্যও হাতে আসে। নিজে পড়ে, সন্তোষবাবুকে দিলাম। খুব খুশি হলেন।

আমি ও অরুন্ধতী সন্তোষবাবুকে লিখবার জন্য প্রায়ই তাগাদা দিতাম। তিনি বলতেন, 'কী হবে! আমার লেখা কেউ পড়ে না।' কেন জানি না, নিজের লেখা বিষয়ে একটা অন্তর্নিহিত দুঃখ ছিল তাঁর। একদিন স্টুডিয়োতে পাহাড়ী স্যান্যালকে বললাম, 'আনন্দবাজারে সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা পড়েছেন?' পাহাড়ীদা সবসময় ফরাসি ভাষায় লেখা বই পড়তেন, উন্নাসিকতাও ছিল। তবে আমার কথা ফেলতে পারেননি। পড়ে আমার কাছে এসে বললেন, 'কে রে ভাই এই সন্তোষকুমার ঘোষ—আমার সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দিবি ?' দিয়েছিলাম। পাহাড়ীদা সন্তোষবাবুকে জড়িয়ে ধরে অনেক আশীর্বাদ করেন।

কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। সন্তোষবাবুর অভিমান যায় না। একদিন রেগে বলেছিলাম, 'আপনি কি চান '—' লেখকের মতো আপনার লেখা হু হু করে বিক্রি হবে ? কোনও দিনই হবে না।'

নিউ আলিপুরে আমাদের পাড়াতে থাকতেন বলে সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বেশি হত। কিছু লিখলে, প্রায়ই নিয়ে এসে শোনাতেন। শুধু ভাল লাগত বললে ভুল হবে, একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হত। আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই একটু দূরত্ব রাখতাম। সে কারণে আমাদের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মধুর ছিল। আমার 'অতিথি' ছবির ইংরেজি সাব-টাইটেল করে দিয়েছিলেন সন্তোষবাবু। ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল সুন্দর। মনে আছে, 'এই আকাশে আমার মুক্তি'-র ইংরেজি করেছিলেন, আই সিক ফ্রিডম ইন দ্য স্কাই—ইন ডাস্ট—ইন গ্রাস।' একদিন সকালে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার ক্যানসার হয়েছে।' হাসির কথা নয়, শেষপর্যন্ত ক্যানসার হল তাঁর। যাবার আগে 'লেখায় আঁকা কিছু রেখা' রেখে গেছেন আমাদের জন্য, যা জীবনকে মায়াময় করে তোলে।

গৌরকিশোর একদিন বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে বলল, 'শুধু বিদেশি বই পড়বে ? আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের লেখা পড়বে না ?' বললাম, 'কাদের কথা বলছ ?' গৌরকিশোরের উত্তর, 'মতি নন্দী, দিব্যেন্দু পালিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়দের লেখা। এরা বেশি লেখে না। কিন্তু এদের সততা, সাহস, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, নতুন কিছু করার চেষ্টা—এগুলো না জানলে কী করে চলবে ?'

এসব প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। তখন সত্যিই এঁদের লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ওঠেনি। পড়ে ক্রমশ চমকিত হলাম। এঁরা যুগের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলেছেন। সর্বতোভাবে গোলমেলে সময়টাকে নিজেদের মতো বুঝে নতুন নতুন বিষয়ে পরিক্রমা করার চেষ্টা করছেন। নতুন ধরনের চরিত্র এসেছে, শুরু হয়েছে ঘটনার নতুন বিশ্লেষণও। মহারাষ্ট্র, কেরল ও কর্ণাটকের কিছু তরুণ সাহিত্যিকের লেখা পড়েও মুগ্ধ হয়েছি। দুঃখ এই, ভারতীয় সাহিত্য নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রে এত অবক্ষয় কেন ? রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পাওয়া, বিদেশে যাওয়া—এসব বড় কথা নয়, কালজয়ী সৃষ্টি কিছু কি হচ্ছে ?

মাসখানেক আগে গৌরকিশোর দুবার এসেছিল আমার জীবনের চরম দুর্দিনে। ও যখনই আসে 'চাঁদ ওঠে সিন্ধু পারে'। অপার আনন্দ দিতে পারে মানুষকে। শুটিং করার সময় আমাকে একবার একটা হাতি মেরে হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছিল। উড়ল্যাণ্ডস নার্সিংহোমে অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায়

স্বরূপ দত্ত ও অপর্ণাকে নির্দেশ দিচ্ছেন—'এখনই' *(ছবি : সুকুমার রায়)*

নির্মলকুমার, মনোজ মিত্র ও দীপঙ্কর—'বাঞ্ছারামের বাগান' *(ছবি : সুকুমার রায়)*

৭

রবিশঙ্কর আমার দুটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন, 'কাবুলিওয়ালা' আর 'কালামাটি'। 'কালামাটি' রমাপদ চৌধুরীর ছোট গল্প 'বিবিকরজ' অবলম্বনে করা ; বিবিকরজ মানে বেবী ক্রেশ। কোলিয়ারির পটভূমিকায় লেখা এই গল্পের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব সেই যুগে অর্থাৎ আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে আমাকে টেনেছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রে রবিশঙ্করের পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে এটুকু বলতে পারি সিনেমায় আবহসঙ্গীত রচনায় তাঁর জুড়ি নেই। ছবিটি আগে দেখতেন, তারপর দু-একদিন ভাবতেন। সেই ভাবনাটা মাথার ভিতরেই থাকত, লিখে রাখাটাখার ধার ধারতেন না, একেবারে স্টুডিয়োতে বসে কম্পোজ করতেন। অনর্গল নোটেশন বলে যেতেন আর মিউজিশিয়ান সেগুলি লিখে নিত। তিনি ছন্দের রাজা, সবচেয়ে বড় কথা, প্রচলিত বাজনার চেয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির নেশায় মেতে থাকতেন সবসময়। আজও আছেন।

'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে আফগানিস্থানের গান নিয়ে এসেছিলেন কাবুল থেকে, সেই সুরের উপর নির্ভর করে কম্পোজ করেছিলেন অন্যান্য আবহসঙ্গীত। 'কালামাটি' ছবিতে সাঁওতাল কুলিদের গানের দু-একটি নোট তুলে নিয়ে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়েছিলেন এক শ্রুতিমধুর সঙ্গীত। এর মধ্যে আবার কীর্তনের রেশও ছিল। প্রচণ্ড পরিশ্রমী মানুষ—এতটুকু ফাঁকি ছিল না কোথাও। যতক্ষণ না আমার পছন্দ হত উনি বার বার মিউজিকে রঙ বদলাতেন। সত্যি বলতে, যাঁরা বাজাতেন তাঁদের কখনও কখনও ক্লান্ত হতে দেখলেও রবিশঙ্করের মধ্যে ক্লান্তি বলে কোনও ব্যাপার কোনওদিন দেখিনি।

এই সূত্রেই এসে পড়ে 'শতাব্দীর শিল্পী' আলি আকবর খাঁ সাহেবের কথা। তাঁর সঙ্গে দুটি ছবি করি, 'ক্ষুধিত পাষাণ' আর 'ঝিন্দের বন্দী'। 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রসঙ্গে অপরাধের মধ্যে তাঁকে বলেছিলাম বাগেশ্রী আর কানাড়ার উপর নির্ভর করে সব মিউজিক করলে কেমন হয় ? অবশ্যই চিত্রনাট্য শোনাবার পর। একটু ভাবলেন আলি আকবর, তারপর সরোদ

পড়ে আছি, গৌরকিশোর এল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও বললাম, 'জানো, প্রথম বুকে মারতেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে যখন পিঠে মারল, জ্ঞান ফিরে এল।' গৌরকিশোর বলল, 'আমারও একবার তাই হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে রাজনীতি করতে গেছি—প্রথমে এক ডাণ্ডা খেয়েই অজ্ঞান। দ্বিতীয় ডাণ্ডায় জ্ঞান ফিরে এল।' হাসতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও হাসতে লাগলাম।

অরুন্ধতী প্রায়ই বলতেন, 'ও যে কত বড় দুষ্টু, ওর 'ব্রজবুলি' পড়লেই তা বোঝা যায়। আমাকেও ছাড়েনি—ওর ব্রজদা নাকি আফ্রিকা থেকে অরুন্ধতী তারার দিকে তাকিয়ে পথ চিনে কলকাতায় এল। রাম পাজি!'

আমার জীবনে পাওয়া অনেক, তার মধ্যে গৌরকিশোরকে বন্ধুরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। বাংলাসাহিত্যে গৌরকিশোরের অবদান সর্বজনবিদিত। কিন্তু একটা ব্যাপার অনেকেই লক্ষ করেননি। ওর সাহিত্যে সিনেমার ভাষা প্রয়োগ। 'তলিয়ে যাবার আগে' গল্পটিতে যখন মেয়েটিকে গাড়ি করে জোর জবরদস্তি নিয়ে যাচ্ছে, তখনকার বর্ণনা শুধু এক-একটি শব্দ। শব্দগুলি যেন সিনেমার এক-একটি শট। ভিসুয়াল অন্তর্নিহিত। একই ধরনের প্রয়োগ 'প্রেম নেই' উপন্যাসে। জলের তলায় মাছের সঙ্গে লড়াই। গৌরকিশোর সম্বন্ধে লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে, তাই এখানেই থামলাম।

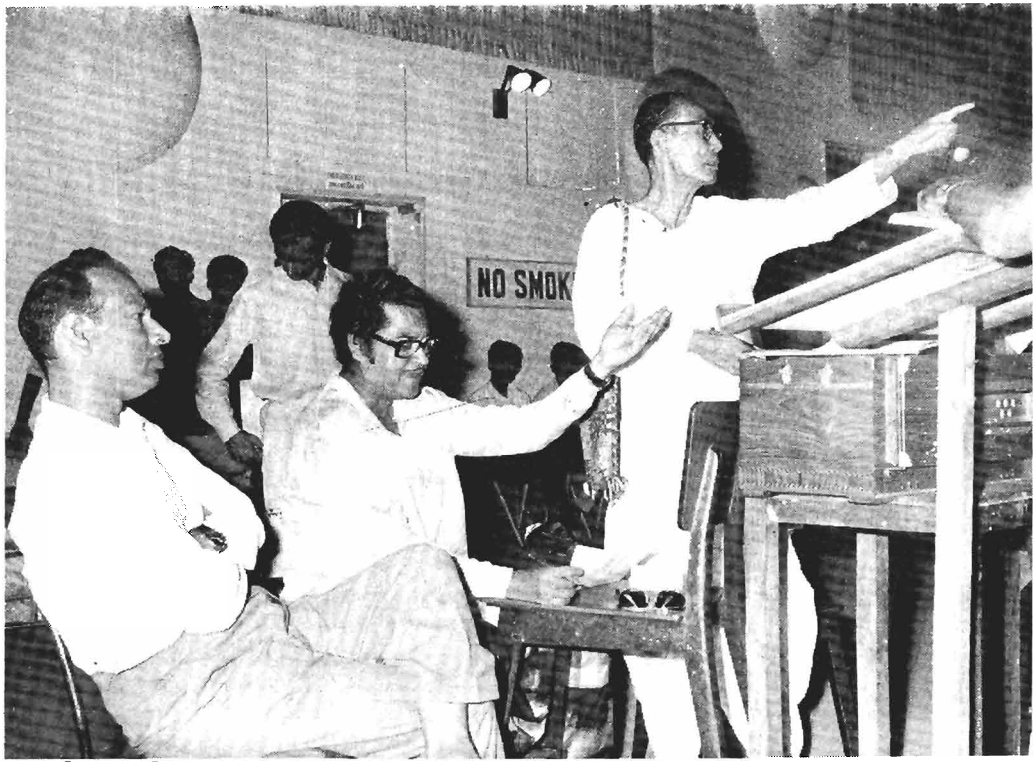

'জিন্দেগী জিন্দেগী' ছবির সংগীত গ্রহণের সময় তপন সিংহ, কিশোরকুমার ও শচীন দেববর্মণ। পেছনে সহকারী পরিচালক অমিতাভ দাশগুপ্ত।

অশোককুমার, ইফতিয়ার খাঁ ও তপন সিংহ—'জিন্দেগী জিন্দেগী' ছবির শুটিং চলাকালে।

শাবানা ও তুপন সিনহা—'এক ডক্টর কী মৌত' *(ছবি : সুকুমার রায়)*

দীপ্তি নাভালকে নির্দেশ দিচ্ছেন—'দিদি' টেলিফিল্ম *(ছবি : সুকুমার রায়)*

নিয়ে বসলেন। ঘর থেকে চলে যেতে বললেন আর সবাইকে। প্রায় মুহূর্তের মধ্যে বাজিয়ে শোনালেন পাঁচ ছ-খানা বাগেশ্রীর মুখ। বললেন, 'এর মধ্যে যেটা আপনার পছন্দ তার ওপরেই কাজ করব।'

প্রথমে সব গুলিয়ে গিয়েছিল আমার ; তারপর যেটা 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলির' কাছাকাছি, সেটাই ঠিক করলাম। মনে মনে অবশ্য ভাবলাম কার কাছে খাপ খুলতে গেছি! ওই ছবিতে কৌশিকী কানাড়ার উপর চিরবিরহীর বেদনা-ভারাক্রান্ত থিম মিউজিক করা হয়েছিল। দেশে বিদেশে প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছিলেন আলি আকবর খাঁ।

একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বলব। মিউজিক আর এফেক্ট সাউণ্ড লাগিয়ে রিরেকর্ডিং করার সময় মনে হল একটা জায়গা খালি খালি লাগছে একটু, এফেক্ট মিউজিক হলে ভাল হয়। দৃশ্যটা ছিল—এক অনিবার্য স্বপ্নের টানে সৌমিত্র চ্যাটার্জি পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। স্টুডিয়ো থেকে জানালাম আলিদাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলেন সরোদ নিয়ে, দু-তিন বার দৃশ্যটি দেখলেন। একটা কাচের ঘরে বসিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। ছবির সঙ্গে ঝঙ্কার দিলেন সরোদে, মনে হল পঞ্চাশটা সরোদ একসঙ্গে বাজছে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজকে ছন্দ করে গোটাকতক প্যাশনেট নোট ছাড়লেন অসাধারণ ভঙ্গিমায়, যা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

একবার বর্ধমানের মহারানি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে আমাকে আর আলিদাকে সংবর্ধনা দিলেন। অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। আমাদের দেখার জন্য নয়, একই সঙ্গে যে উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেনকেও সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে তা জানতাম না। ওঁদের জন্যই এত ভিড়। উত্তম এসেছিল, কোনও কারণে সুচিত্রা দেবী আসতে পারেননি। ফলে প্রচণ্ড হাঙ্গামা। অনেক কষ্টে দর্শকদের শান্ত করে উদ্যোক্তারা ঘোষণা করলেন আলি আকবর খাঁ সরোদ শোনাবেন। আমি ঘোর আপত্তি করলাম। এই উচ্ছৃঙ্খল দর্শকের সামনে কিছুতেই আলিদাকে বাজাতে দেব না। উত্তমও একমত, উদ্যোক্তাদের এক হাত নিল। বেচারি বর্ধমানের রানি তখন ভয়ে কাঁপছেন। এ ধরনের তাণ্ডব তিনি আগে দেখেননি, কল্পনাও করেননি। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলেন আত্মবিশ্বাসী আলিদা। হেসে বললেন, 'ভাবছেন কেন ? কিচ্ছু হবে না, চলুন।'

পর্দা উঠল। আলিদার একপাশে আমি, অন্য পাশে উত্তম। উত্তমকে দেখেই জনতা সিটি আর হাততালি দিতে শুরু করল। মহাপুরুষ মিশ্র তবলা বাজাবেন। আমি উত্তমকে বললাম, 'রেডি থাকিস। আলিদাকে লক্ষ করে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়লে দুজনে বাঁয়া তবলা দিয়ে আটকাবার চেষ্টা করব।' শুনে আলিদা হেসে গড়িয়ে পড়েন আর কি। শুরু করলেন আলাপ। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই অশান্ত জনতা শান্ত হল। অকস্মাৎ দ্রুত ত্রিতালে গত্। দশ

মিনিটের মধ্যে এত দ্রুত লয়ের কাজ দেখালেন যে ঘন ঘন হাততালিতে হল প্রায় ফেটে পড়ে। এই ছোট্ট ঘটনা আমার কাছে এক বিরাট ও চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

গত বছর সানফ্রানসিস্‌কোতে আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক দেখতে গিয়েছিলাম। ম্যাকারথার পুরস্কার পাবার পর সবাই এখন আলি আকবরকে বিশ্ব-নাগরিক মনে করে। কলেজে গিয়ে দেখলাম, প্রায় শ'খানের কুড়িজন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী সরোদ আর সেতার নিয়ে রেওয়াজে বসেছে। গুরু আলি আকবর ছোট্ট একটা ডায়াসে বসে সরগম্‌ বলছেন, বেশ কঠিন সরগম্‌, আর ওরা পরম শ্রদ্ধায় তুলবার চেষ্টা করছে। থেকে থেকেই বলছেন আলিদা, 'স্ট্রেচ্‌ ইয়োর মাস্‌ল্‌ টু ইয়োর হার্ট।' ফিরে আসার সময় আমাকে বললেন, 'জানেন, প্রায় হাজার খানেক নতুন কম্পোজিশন করেছি।' এইভাবেই ভারতীয় সঙ্গীতকে নব নব রূপে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে চলেছেন আলি আকবর।

রবিশঙ্করের সঙ্গে একবার দেখা হয় পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে। তিনি তখন প্রথম 'রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হল'-এ বাজাবেন। আমি ছিলাম কেমব্রিজে, জগদীশচন্দ্র বসু ডকুমেন্টারি ছবির জন্য ক্রাইস্টচার্চ কলেজে শুটিং করছিলাম। ইণ্ডিয়া হাউসে দেখা হল রবিশঙ্কর আর আল্লারাখার সঙ্গে। রবিবাবু নিমন্ত্রণ জানালেন। তখন তাঁর বাজনা শুনতে বিদেশিদের ভিড় বেশি হত না। গিয়ে দেখি শ্রোতাদের প্রায় নব্বই ভাগই ভারতীয়। রবিবাবু শ্রোতা দেখে বাজাতেন না। নিজের সর্বস্ব ঢেলে দিতেন। হঠাৎ দেখলাম পাশে উপবিষ্ট এক লণ্ডন প্রবাসী বঙ্গসন্তান ফস করে সিগারেট ধরালো। বললাম, 'এখানে কিন্তু সিগারেট খাওয়া নিষেধ,' শুনলেন না। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে নীল স্যুট-পরা এক গার্ড কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে তাঁর হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে চলে গেল।

'ঝিন্দের বন্দী' ছবিতে একটি নতুন ধরনের রাগমালা করেছিলেন আলি আকবর খাঁ। দৃশ্যটি ছিল, ঝিন্দের মদ্যপ রাজা অভিষেকের আগে প্রচুর মদ্যপান করেছেন। আমি আলিদাকে বললাম, 'নেশাটা মিউজিক্যালি করা যায়?' উনি বুঝতে না পেরে বললেন, 'কী রকম?' বললাম, 'ধরুন, কোনও একটা রাগ দিয়ে শুরু করে মদের নেশায় অন্য রাগে চলে যাচ্ছে। এরকম চার-পাঁচটা রাগ মিলিয়ে যদি মিনিট দুয়েকের একটা রাগমালা করা যায়—আসল কথা অসংলগ্নতা।' আলিদা বললেন, 'খুব সুন্দর হবে। তাহলে, একটা হিন্দু ঘরানার রাগ দিয়ে শুরু করি। তাতে অভিষেক বা বিবাহ বা কোনও শুভ কাজের আভাস পাওয়া যাবে।' শুরু করেছিলেন বিখ্যাত মুখড়া 'দিন গিন দেরে বামনা' দিয়ে। এত সুন্দর হয়েছিল যে বহু চিঠি পেয়েছিলাম, 'আরও একটু লম্বা করলেন না কেন?' ইচ্ছে করেই

দর্শকদের অন্তরে একটু খিদে রেখেছিলাম। সম্পূর্ণতার প্রতি ঝোঁক অনেক সময় রসের হানি ঘটায়।

উদয়পুরে এক টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। নাম নাথুরাম। 'ঝিন্দের বন্দী' ছবির জন্য উদয়পুরে লোকেশন দেখতে যাচ্ছি, স্টেশনে তার সঙ্গে পরিচয়। তার টাঙ্গায় চেপে 'লক্ষ্মীবিলাস' হোটেলের দিকে যাওয়ার সময় বললাম, 'কলকাতা থেকে দিন দশেক আগে চিঠি দিয়ে রুম বুক করেছিলাম। লক্ষ্মীবিলাস বিরাট হোটেল, তার ওপর বিদেশিদের ভিড়। ঘরটা রেখেছে তো? নাহলে বিপদে পড়ব। আমি তো আবার এখানে কাউকে চিনি না।' নাথুরাম বলল, 'লক্ষ্মীবিলাসেই আপনার ঘরের ব্যবস্থা করে দেব।' ওকে আমার উদ্দেশ্য জানিয়ে বললাম, 'শুটিং-এর উদ্দেশ্য নিয়ে আসা। এখন শুধু জায়গাগুলো দেখে যাব। দু মাস পরে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে নিয়ে এসে শুটিং করব।' খুব খুশি হয়ে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, হুজুর, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সত্যিই সব ব্যবস্থা নাথুরাম একাই করে দিয়েছিল। 'লক্ষ্মীবিলাস' হোটেলে গিয়ে টের পেলাম কী খাতির তার। যদিও হোটেল আমার চিঠি সময়মতোই পেয়েছিল। ঘরও বুক করা ছিল, তবু নাথুর খাতিরে বিশেষ আতিথেয়তা পেলাম। শুধু লক্ষ্মীবিলাস হোটেলের লোকজনই নয়, সমস্ত উদয়পুরের মানুষ তাকে ভালবাসে। একজন সত্যিকারের সৎ মানুষ। এক ডজন ঘোড়া চাই। নিয়ে গেল এস· পি· সাহেবের কাছে। পুলিশের ঘোড়ার ব্যবস্থা হল। এস· পি· সাহেব বললেন, 'আপনি তো ভাল লোককেই ধরেছেন। আমরা সবাই নাথুকে ভালবাসি।' রাজবাড়ির শিকারের তাঁবু দরকার। নাথু নিয়ে গেল রাজবাড়িতে, ব্যবস্থাও হয়ে গেল। পুলিশের এক ডজন ঘোড়ার উপর আরও তিরিশটা ঘোড়া দরকার। নাথুরাম বলল, 'হুজুর, আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিন। আমি উদয়পুরের বাইরে থেকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' তা-ই করেছিল।

পরে যখন শুটিং করতে যাই তখন আমাদের প্রত্যেকের থাকবার জন্য পুরো একটা ছোট হোটেল ঠিক করেছিল। টাঙ্গা নিয়ে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ডিউটি করত। প্রতিদিনের যা রোজগার তা-ই নিত— একটি পয়সা বেশি চায়নি কোনও দিন। শুটিং-এর সময় কোনও জিনিসের হঠাৎ দরকার হলে ধুলো উড়িয়ে ছুটত নাথুরামের টাঙ্গা। মুহূর্তে সেই জিনিস হাজির হত।

শুটিং শেষে সকলে কলকাতা ফিরে গেল। আমি থেকে গেলাম আরও একদিন। যাওয়ার দিন সকালে এসে বলল, 'হুজুর, একবার আমার বাড়িতে যাবেন?' ওর বাড়ি গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ঘোড়ার আস্তাবলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সব ঝকঝক-তকতক করছে। দুটি মাত্র ঘর। কিন্তু কী সুন্দর

করে সাজানো। এক তরুণ এসে প্রণাম করল। নাথু বলল, 'আমার ছেলে হুজুর, এবার বি·এ· পাশ করেছে।' ছেলেটি বলল, 'সব বাবার জন্যে। আমাকে পড়াবার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন।' নাথু বলল, 'এম· এ· পড়তে দিল্লি যাবে বলছে, পাঠাবো হুজুর ?' বললাম, 'নিশ্চয়ই পাঠাবে। ও অনেক বড় হবে।'

বেলা তিনটের সময় ওর টাঙ্গায় চেপে এয়ার স্ট্রিপে গেলাম। ছোট্ট ডাকোটা প্লেন, জয়পুর হয়ে দিল্লি যায়। প্লেনে ওঠবার আগে বিস্ময়ে খানিক তাকিয়ে থাকলাম নাথুর দিকে। মনে হল, পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা মানুষ আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কতদিন আগেকার কথা, তবু নাথুরামের কথা এখনও হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে। আশা করি সততায় ঘেরা জীবনে তার স্বপ্ন সফল হয়েছে। শুধু বিখ্যাত মানুষদের কাছেই নয়, নাথুরামদের মতো মানুষের কাছেও আমি অনেক শিখেছি।

৮

'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' নিয়ে ছবি করব। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে অভিপ্রায় জানালাম। এও বললাম, ছবিটা দু' খণ্ডে করলে ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের ছবির প্রচলন নেই। বাধ্য হয়ে একটি খণ্ডেই যা করার করতে হবে। তিনি রাজি হলেন। শুধু বললেন, 'একটা কথা মনে রেখ, হাঁসুলিবাঁকের কথা নয়—উপকথা।' বললাম, 'সেইজন্যেই তো করতে চাইছি। নইলে 'গণদেবতা' বা 'পঞ্চগ্রাম' নিয়ে ছবি করতাম। তবে, দাদা, জানি না পারব কিনা।' বললেন, 'লেগে পড়ো। খুব ভাল হবে।'

'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' আমাকে আকর্ষণ করেছিল এই কারণে যে চরিত্রগুলি ক্রীতদাসের জীবনযাপন করলেও তাদের জীবনে আনন্দ ছিল, গান ছিল, কবিতা ছিল, প্রেম ছিল। শত দুঃখ, লাঞ্ছনার মধ্যে তারা জীবনের সৌন্দর্যও উপভোগ করত। তাদেরই একজন, করালী, বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই ধরনের কিছু-কিছু ছবিতে যেমন দেখি, বাইরে থেকে কাঁধে ঝুলি নিয়ে কোনও স্কুলমাস্টার তাদের মুক্তির কথা শেখাতে আসেনি, তারা নিজেরাই তাদের বিরাট শক্তি অনুভবের মধ্য দিয়ে নিজেদের পথ খুঁজে নিয়েছিল। এইটিই হচ্ছে সত্যিকারের জীবনের কথা।

'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' এক অনবদ্য রচনা। তেমনই অনবদ্য তারাশঙ্করের গান। তার আবেদনও সম্পূর্ণ আলাদা। বীরভূম বলতে আমরা শুধু বাউলাঙ্গের গান মনে করি। কিন্তু তারাশঙ্করের গানে নদীয়া থেকে কীর্তনের মৃদু জোয়ার এসে সাঁওতালি শব্দের সঙ্গে এক নতুন রস পরিবেশন করে। যেমন—

'গোপনে মনের কথা বল্‌তে দে গো
আঁধার গাছতলায়,
আহা ঠাণ্ডা শেতল সাঁঝ বেলায়।'
কিংবা,
'যে রঙ আমার ভেসে গেল কোপাই নদীর

জলে হে
সে রঙ বুঝি লেগেছে সই লাল শালুকে
গায়ে হে।'
বা,
—'অত তুই যেতে সড়ানে
ধাক্কা লেগেছে পরাণে।'

যাই হোক, স্ক্রিপ্ট্ করে তারাশঙ্করদাকে শোনাতে গেলাম। তিনি শুনলেন না। বললেন, 'দ্যাখো, আমি সিনেমার কিছু বুঝি না। নাটক হয়তো একটু-আধটু বুঝি। আমি শুনে কি করব ? ও তুমি যা হয় করো।' বললাম, 'লোকেশন দেখতে লাভপুর যাব। সঙ্গে ক্যামেরাম্যান বিমলবাবু আর আর্ট ডিরেক্টর সুনীতি মিত্র থাকবে।' এবার তারাশঙ্করদা নড়েচড়ে উঠলেন, 'চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই। তোমাকে একটু গ্রাম দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

তারাশঙ্করদার সঙ্গে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা চিরকাল মনে থাকবে। মাইলের পর মাইল হেঁটেছি আর গ্রামের ইতিহাস শুনেছি। সে যে কত বিচিত্র মানব চরিত্রের ইতিহাস !

মাঠের মধ্যে একটি গাছের তলায় আমরা দাঁড়ালাম। ওঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বর্ষাস্নাত মধ্যাহ্ন। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। সুনীতি ফ্লাস্ক থেকে চা দিলে, আমি একটা সিগারেট দিয়ে বললাম, একটু বিশ্রাম করে নিন। হঠাৎ দেখি সিগারেট টানতে টানতে উদাস দৃষ্টিতে দূরের এক গ্রামের দিকে তাকিয়ে আছেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তপন, তোমার সঙ্গে একটা বাজি ধরতে চাই। শুধু লাভপুরেই নয়, আশপাশের গ্রামে কতগুলো গাছ আছে আমি তা বলে দিতে পারি। ধরবে বাজি ?' বললাম, 'না। আপনিই এসব পারেন। আমরা মানুষের হিসেবই রাখতে পারি না তো গাছ !'

অনেক গ্রাম ঘুরে, দেখেশুনে বললাম, 'দাদা এক কাজ করলে হয় না ? বনোয়ারি, করালী, পাখি, নসুবালা এদের বাড়িগুলো তো আজও আছে। ওই বাড়িগুলোতেই শুটিং করব। নাই বা জানল আর কেউ ? শুধু আপনি আর আমি জানলাম।' খুব খুশি হলেন।

কলকাতায় ফিরে প্রচুর উৎসাহে কাজ শুরু করলাম। দেখলাম বিরাট ইউনিট হচ্ছে। টেকনিসিয়ান আর্টিস্ট মিলিয়ে প্রায় শ খানেক। বছরের বিভিন্ন সময় প্রায় আট-দশ মাস ধরে শুটিং করেছিলাম। চেয়েছিলাম হাঁসুলিবাঁকের উপর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা— তিনটি ঋতুই ক্যামেরায় ধরব।

কাজ শুরু হল। মাঝে মাঝে তারাশঙ্করদা লোকেশানে আসেন।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির দাপটে চারদিক ঝাপসা। আমরা শুটিং করে চলেছি। হঠাৎ পিছন থেকে তারাশঙ্করদার গলা— 'এঃ, এই জল কাদায় তোমার সোনার মতো রঙের কি অবস্থা হল গো!' ফিরে দেখি ওয়াটার প্রুফ আর টুপি পরে চলে এসেছেন। বললেন, 'এই সিনটা হয়ে গেলে সবাই ওই গাছতলায় এসো।' দেখি সকলের জন্য কয়েক ধামা মুড়ি আর কয়েক হাঁড়ি বীরভূমের বিখ্যাত বেগুনপোড়া নিয়ে এসেছেন।

যে কটা দিন লাভপুরে থাকতেন রোজ সন্ধ্যায় ওঁর কাছে গিয়ে বসতাম। মহাভারতের গল্প বলতেন। এই রকম প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত চলত। মাঝে মাঝে বলতেন, 'প্লটের বুনুনিটা একবার দেখ। কি উদ্ভাবনী ক্ষমতা!' কখনও কখনও বলতেন, 'জানো, বাংলার গ্রামে অনেক কাহিনীকার ছিল। ওদের ভাষায় কাহানি, রাজা-রানি আর রাজকন্যার কাহানি। প্রায় পনের-ষোলো রাত ধরে এক-একটা কাহানি চলত। লেখাপড়া জানে না, অথচ কাহানি তৈরি করতে জানে। সারাদিন মাঠের কাজ করে আর রাতে কারও দাওয়ায় বসে কাহিনীকার কাহানি বলে। লম্প জ্বলে টিমটিম করে। শ্রোতারা সব অন্ধকার উঠোনে বসে শোনে। আজ যেখানে শেষ হয় কাল আবার সেখান থেকে শুরু হয়।'

একদিন সন্ধ্যায় এক বৃদ্ধা দেখা করতে এল। মাটিতে উবু হয়ে বসে তারাশঙ্করদাকে প্রণাম করে বলল, 'বাবুকে একটিবার দেক্‌তে এলাম।' তারাশঙ্করদা আমাকে বললেন, 'হাঁসুলিবাঁকের নসুবালা।' বুঝলাম আসলে ও বৃদ্ধা নয়, বৃদ্ধ। মেয়েদের মতো কাপড় পরে রাশি রাশি পাকা চুলের একটি খোঁপা করে এসেছে। তারাশঙ্করদারই সমবয়সী। বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে নসুবালার মতো কোনও চরিত্র কোথাও পাইনি। প্রকৃতির খেয়ালে বঞ্চিত, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা, মদ খেয়ে নসুবালার সেই গান—

'আমার বিয়ে যেমন তেমন
দাদার বিয়ে রাই বেশ্যে,
আয় ঢকাঢক্ খেস্যে।'

কোনওদিন ভুলব না।

ছবিতে নসুবালাকে সম্পূর্ণ মেয়ে করে আমি বিরাট ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম দর্শক হয়তো নারীর মতো ঢংওয়ালা পুরুষ চরিত্র পছন্দ করবে না। ফলে চরিত্র তার বৈশিষ্ট্য, স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়েছিল। অপরিসীম মূর্খতা আমার।

তারাশঙ্করদা বললেন, 'নস্যে, বাবুকে একখানা গান শোনা।' সঙ্গে সঙ্গে কানে হাত দিয়ে ভাঙা, কম্পিত কণ্ঠে গাইবার চেষ্টা করল, 'আহা চিরদিন

যারে ভালবাসি, তারে ভুলিব কেমনে ?' একটু গেয়েই নমস্কার করে বলল, 'আর পারি না গো— দম পাই না, হাঁপানি যে !' তারাশঙ্করদা বললেন, 'হাঁপানি নয়, গাঁজা খেয়ে ওইরকম গলার অবস্থা হয়েছে। কী সুন্দর গাইতিস্ নাচতিস তুই !' আমাকে বললেন, 'যৌবনে কী আকর্ষণ ছিল ওর, কী বলব। আমিই ভালবেসে ফেলেছিলাম !'

ছবির শেষ দৃশ্যে যখন বন্যা সরে গেছে, কচি কচি ঘাস গজিয়েছে হাঁসুলিবাঁকের বুকে, করালী হাজার হাজার মানুষ নিয়ে নতুন ঘর তৈরির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন সেই দৃশ্যে হাজার দুই গ্রামবাসী চেয়েছিলাম। তারাশঙ্করদার ছোট ভাই পার্বতীদা (চলচ্চিত্র পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা) জোগাড় করে দিয়েছিলেন। ছবিটি ভাল চলেনি। কিন্তু ছবিটি করতে আমার বড় ভাল লেগেছিল। পুরো টিম মিলে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলাম। অসাধারণ কাজ করেছিলেন ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায়। তারশঙ্করদা আর আমাকে নিয়ে গ্রামের মানুষও গান তৈরি করেছিলেন। 'হাঁসুলিবাঁকের ইতিকথা'য় তা লিপিবদ্ধ আছে।

ঠিক এই সময় আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ পাই। সানফ্রানসিস্কো ফেস্টিভ্যালে চারজন জুরির মধ্যে আমি একজন। অন্যান্য জুরির মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার আর্থার মিলার এবং চেয়ারম্যান ছিলেন জোসেফ ফন্ স্ট্যানবার্গ— যিনি সেই কোন নির্বাক যুগ থেকে ছবি করে চলেছেন। তিনিই আবিষ্কার করেন মার্লিন ডিয়েট্রিচকে। তাঁর বিখ্যাত ছবি 'ব্লু এঞ্জেল' এমিল জেনিংস আর মার্লিন ডিয়েট্রিচকে নিয়ে। ওই ছবিতে ছিল মার্লিনের সেই বিখ্যাত গান, 'ফল ইন লাভ এগেন।'

ফেস্টিভ্যালে চিত্রপরিচালক ফ্রেড জিনেম্যানও উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দু' সপ্তাহ সবাই মিলে একসঙ্গে ছিলাম। খুব সুন্দর কেটেছিল। শুধু এক রাশিয়ান জুরির সঙ্গে আমার খটাখটি লেগে গেল। শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কারের জন্য ছেঁটেকেটে শেষ দুজন দাঁড়াল জাপানের তাকামিনি আর সোভিয়েত রাশিয়ার নিনা। আমার ভোটটি ছাড়া দুজনেই ভোট পেয়েছিলেন সমান-সমান। সুতরাং আমার ভোটের উপর নির্ভর করছিল দুজনের ভাগ্য। রাশিয়ান জুরি মহিলা ভেবেছিলেন রাজনৈতিক কারণে আমি নিনাকেই ভোট দেব। কিন্তু আমি ভোট দিয়েছিলাম জাপানের তাকামিনিকে। ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড রেগে অভিনয়শিল্প কাকে বলে তাই নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। আমিও আধঘণ্টা ধরে মৃদু হেসে মিষ্টি মিষ্টি করে উত্তর দিলাম। ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। কিন্তু আমার এতটুকু দুঃখ হয়নি।

পুরস্কার বিতরণী সভায় আমি উঠে গিয়ে মহিলাকে বললাম, 'আমি ছবির ভাল বিচারক না হতে পারি, কিন্তু ভাল কফি ঢালতে পারি। তোমাকে এক

কাপ ঢেলে দেব ?' মহিলা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'নিয়েত !' শুনে আর্থার মিলার ফিসফিস করে আমাকে বললেন, 'তোমার হোটেলের ঘরে নিয়ে যেতে চাইলে না কেন ? রাজি হয়ে যেত। ককটেলে এসে কেউ কফির কথা বলে ! তুমি একেবারে শিশু !'

ফেস্টিভ্যাল শেষ হলে আমার হলিউডে যাওয়ার কথা। প্লেনের টিকিটও করা ছিল। এমন সময় জোসেফ ফন্ স্ট্যানবার্গ বললেন, 'আমার সঙ্গে গাড়ি করে হলিউড চলো। এই বৃদ্ধকে একটু সঙ্গ দাও।'

চললাম তাঁর সঙ্গে। সাত-আট ঘণ্টা একা ড্রাইভ করা বড় কষ্টকর। প্রশান্ত মহাসাগরের পাশ দিয়ে সুন্দর রাস্তা। প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। তখন ছিল হাইওয়ে। আজকের মতো মাথা ঘোরানো থ্রী-ওয়ে ছিল না।

পুরনো দিনের হলিউডের অনেক কথা শুনলাম। শুনলাম চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, হ্যারল লয়েড গ্রিফিথের কথা। কত কাহিনী ! একদিকে অকল্পনীয় ঐশ্বর্য, অন্যদিকে অসংযমী জীবনের জন্য কত আত্মহত্যা, কত মানুষের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কথা। নিজের, অর্থাৎ জোসেফ ফন্ স্ট্যানবার্গের সঙ্গে মার্লিন ডিয়েট্রিচের প্রেম ও বিচ্ছেদের কথা— তাও অকপটে বলে গেলেন তিনি।

হলিউডে গিয়ে উইলিয়াম ওয়াইলার, বিলি ওয়াইল্ডার, মার্ক রবসন্ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় হল। ওয়াইলার স্যাম গোল্ডউইন স্টুডিয়োতে লাঞ্চ খেতে নিয়ে গেলেন। এঁদের কেউই কিন্তু সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' দেখেননি তখনও। ওয়াইলারের আবার আসামের জঙ্গল দেখার খুব শখ। বললাম, 'আমাকে আগে জানালে সব ব্যবস্থা করে দেব।'

একদিন হোটেলে ফিরে দেখি জোসেফ ফন্ স্ট্যানবার্গ টেলিফোন করতে বলেছেন। টেলিফোন করলাম। তিনি বললেন, 'আজ রাত আটটায় ফ্রি আছ ?' বললাম, 'আছি।' বললেন, 'ভাল। আমরা একসঙ্গে একজনের বাড়িতে খেতে যাব।'

কথামতো একটি সুন্দর সাজানো বাড়িতে নিয়ে গেলেন স্ট্যানবার্গ। হল পার হয়ে পিছনে সুইমিং পুলের পাশে গিয়ে দেখি, মৃদু আলোয় দাঁড়িয়ে মার্লিন ডিয়েট্রিচ। জোসেফ পরিচয় করিয়ে দিলেন। মৃদু গলায় অনেক আলাপ আলোচনার মধ্যে রাতের খাওয়া হল। বড় ভাল লাগছিল পৃথিবী বিখ্যাত দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গ। বিদায়ের সময় মার্লিন জার্মান কায়দায় সোজা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আই উইশ আই ওয়াজ ইয়াং।' আমি তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ইউ ক্যান নেভার নেভার গ্রো ওল্ড।'

বাস্তবিক, অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম সেই রাতে।

সে বছর বার্লিনে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেল 'অশনি সংকেত'। বম্বেতে

শুটিং করতে করতে খবর পেলাম। খুব আনন্দ হল। এই আনন্দের সঙ্গী ছিলেন দিলীপকুমার। তিনি বললেন, 'আ সিঙ্গল হ্যান্ডেড ভিকট্রি।'

কলকাতায় ফিরলে অরুন্ধতী বললেন, 'মানিকদা বার্লিন থেকে ফিরে তোমাকে টেলিফোন করেছিলেন। বললেন, 'বার্লিনে জোসেফ ফন্ স্ট্যানবার্গ বার বার তপনের কথা বলছিল। বুড়োকে একেবারে কাত করে দিয়ে এসেছে।' ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। জোসেফের বিরাট লাইব্রেরিতে আন্দামান সম্পর্কে কোনও বই ছিল না। আমি কলকাতা থেকে আন্দামান সম্পর্কে তিনটি বই পাঠিয়ে দিই।

৯

সমরেশ বসুর 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে হল। সমরেশবাবুর সঙ্গে কথা বললাম। বললেন, 'রাইট বছর তিনেক হল বম্বের বিমল রায়কে দিয়েছি। তবে উনি বোধহয় করবেন না।' বললাম, 'উনি যদি রাইট ছেড়ে দেন, আমি করতে রাজি আছি। সামনেই তো অর্ধ কুম্ভ। করতেও সুবিধে হবে।' তবে শেষ পর্যন্ত সে-ছবি হয়ে উঠল না।

এরপর একদিন টেলিফোনে সমরেশবাবু বললেন, 'একই স্টাইলে 'নির্জন সৈকতে' নাম দিয়ে একটা বই লিখেছি। একটু পড়ে দেখবেন ?'

পড়লাম। স্থির করলাম 'নির্জন সৈকতে'-ই করব। আসলে বিভিন্ন ধরনের লোকেশান ব্যবহারের আকর্ষণ আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল। সমুদ্র নিয়ে আগে কাজ করা হয়নি। সেটাই বা বাকি থাকে কেন ?

সমরেশবাবুকে বললাম, 'যাবেন আমাদের সঙ্গে আউটডোর শুটিং-এ ? চলুন না ?'

ভবঘুরে মানুষটি সানন্দে রাজি হলেন।

চার-পাঁচ দিন ছিলেন। 'বে-ভিউ' নামে পুরো একটা হোটেল নিয়েছিলাম সবার জন্য। তাই কোনও অসুবিধা হত না। আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা হত না বিশেষ। সারা দিন টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন।

হঠাৎ পুরীতে অসময়ে মেঘের উপদ্রব শুরু হল। শুটিং বন্ধ রাখলাম।

সেই সময়েই 'সী ভিউ' হোটেল থেকে একটা চিঠি এল সন্তোষকুমার ঘোষের। সমরেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে একটা সাইকেল রিকশায় গেলাম সী ভিউ হোটেলে। সন্তোষবাবু তো মহাখুশি। লরেন্স ডারেলের বহুপঠিত 'বাল্‌থাজার' উপন্যাসটিও দিয়ে এলাম তাঁকে। আরও খুশি হলেন। বললাম, 'যাবার আগে ফেরত দেবেন। আমার এখনও শেষ হয়নি, শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে পড়ি।'

চা এল। সেই সঙ্গে শুরু হল রবীন্দ্র প্রসঙ্গ। হঠাৎ সমরেশবাবু বললেন, 'সন্তোষদা যাই বলুন, 'ঘরে বাইরে'-তে সঙ্গীত কিন্তু একেবারে অচল।' মুহূর্তে সন্তোষবাবুর মুখখানা অন্যরকম হয়ে গেল। আমাকে বললেন, 'এই

মুখ্যুটার সঙ্গে আপনি এক রিকশায় এসেছেন, ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে।' উত্তরে সমরেশবাবুর স্বভাবসুলভ নীরব হাসি। এই হাসিটিই ছিল সমরেশবাবুর বিশেষত্ব। সুখে দুঃখে কঠিন সমালোচনায় মৃদু হাসিটি কোনও দিন মলিন হয়নি। কোনও দিন রাগতে দেখিনি। এবারে আমি বললাম, 'রবীন্দ্রনাথের একটা ব্যাপার কিন্তু আপনাকে মানতে হবে। ওঁর হাসির গান শুনে একটুও হাসি পায় না।' একগাল হেসে সন্তোষবাবু বললেন, 'এটা ঠিক বলেছেন।'

একবার একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে গৌরকিশোর, সমরেশবাবু আর আমি একসঙ্গে খেতে বসেছি। সমরেশবাবু বললেন, 'এই যে পাঠক সমাজ আমাকে খারাপ কথা লেখার জন্যে দায়ী করে, জানেন তপনবাবু, সব কিন্তু এই গৌরের কাছে শেখা।'

''নির্জন সৈকতে' একদিন শেষ হল। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিও পেল। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন ছায়া দেবী, ভারতী দেবী এবং রেণুকা দেবী। আমার মতে ছায়া দেবী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের একজন। যুগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে অভিনয় করে গিয়েছেন। বম্বের কিংবদন্তী অভিনেতা অশোককুমার বলতেন, 'জানো, অভিনয় করার সময় জীবনে কাউকে ভয় করিনি। কিন্তু, ছায়ার সঙ্গে অভিনয় করতে গেলে আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি। এত আনপ্রেডিকটেবল!' ওঁরা সম্পর্কে মাসতুতো ভাইবোন। অশোককুমারকে দেখে ছায়া দেবী সবসময় দাঁত-কিড়মিড় করে বলতেন, 'পাগলের ঝাড়!'

একদিন উত্তমকুমার আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, 'তপনদা, আমি একটা ছবি প্রযোজনা করছি। তুমি পরিচালনার ভার নেবে?' বললাম, 'কী ছবি?' উত্তম বললেন, 'যা তোমার ইচ্ছে। এমন কোনও কথা নেই যে আমাকেই ছবিতে অভিনয় করার জন্যে নিতে হবে। যে কোনও অভিনেতাকে নিয়ে কাজ করতে পারো। শুধু চাইছি আমার ব্যানারে তুমি ছবিটা করে দাও।' আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার সঙ্গে কাজ করার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি। যেখানে স্বয়ং তুমি প্রযোজক সেখানে অন্য কোনও অভিনেতার প্রশ্নই আসে না।'

সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ' অবলম্বনে ছবি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমাদের ছাত্রজীবনে ছোট গল্প নিয়ে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব। তাঁর সব গল্পই আমার খুব প্রিয় ছিল। সুবোধবাবুর কাছ থেকে রাইট কেনা হল। স্ক্রিপ্ট্ করে স্থির করলাম সুবোধবাবুকে শোনাবো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এলেন— স্ক্রিপ্ট্ও শুনলেন। স্বল্পভাষী মানুষ, দু-এক কথায় ভাল লাগার ব্যাপারটা জানালেন। বিশেষ করে অন্য যেসব চরিত্র আমি ঢুকিয়েছিলাম সেগুলি তাঁর ভাল লেগেছিল। বলেছিলেন, 'বেশ সঙ্গতি

আছে।'

তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

'জতুগৃহ' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী দেবী। আউটডোর ভাল জমাতে পারিনি। সাহেবগঞ্জের স্টিমার ঘাটে শুটিং হয়েছিল। ভিড়ের চোটে মাথার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। শেষ দৃশ্যে 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে' ব্যাপারটা ঠিক আনতে পারিনি। আর একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল।

উত্তমকুমার যে একজন বিরাট অভিনেতা, একথা সবাই জানেন। কিন্তু, এই বিরাট অভিনেতা হওয়ার পিছনে কী অমানুষিক পরিশ্রম ছিল তাঁর, তা অনেকেই জানেন না। ভোর চারটেয় উঠে প্রতিদিন ময়দানে দৌড়তেন। একজন বিদেশিনীর কাছে নিয়মিত ইংরেজি শিখতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করতেন। শুটিং-এর সময় প্রয়োজন ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনে পায়চারি করতে করতে বিড় বিড় করে সংলাপ বলতেন—চরিত্রের মধ্যে থেকে একটি সংলাপকে কতভাবে বলা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন।

'ঝিন্দের বন্দী'র সময় তাঁকে বললাম, 'ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে।' বললেন, 'আমি একটু-আধটু জানি। তবে তোমার স্ক্রিপ্ট্-এ যেরকম আছে তাতে আমায় মাসখানেক সময় দিতে হবে।'

এক মাসের মধ্যে পাক্কা ঘোড়সওয়ার হয়ে উঠলেন। কোনও শটে ডামি ব্যবহার করিনি। তলোয়ার খেলার জন্য একজন ইংরেজ তলোয়ারবাজকে ঠিক করে দিলাম। র‍্যাকেট ক্লাবে গিয়ে তার কাছে তালিম নিতেন প্রতিদিন। মহানায়ক হওয়ার পিছনে তাঁকে অনেক পরিশ্রম, অনেক নিষ্ঠা, অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছে।

'ঝিন্দের বন্দী'-তে অরুন্ধতী দেবীর বিশেষ কিছু করার ছিল না। কিন্তু তার আগের ছবি 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ তাঁর নির্বাক অভিনয় বত্রিশ বছর পরেও মানুষ মনে রেখেছে। এরকম সংবেদনশীল, নির্বাক অভিনয় ভারতবর্ষে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

১০

বনফুলের কথা আগেই লিখেছি। 'আরোহী' ছবির জন্য রাইট কিনতে যাওয়ার সময় থেকেই ডাকতাম 'বলাইদা' বলে। সম্পূর্ণ অন্য জাতের লেখক। বিরাট বুকের পাটা, দুর্জয় সাহস, একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটিয়েছেন। সেটা হল সততা। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এত বৈচিত্র্য খুব কম লেখকের রচনাতে দেখেছি। ফিজিক্সের উপর 'অগ্নি', ইতিহাসের উপর 'স্বপ্ন-সম্ভব', এভল্যুসানের উপর 'স্থাবর', সমাজ বিজ্ঞানের উপর 'জঙ্গম'। আমাদের সময় 'জঙ্গম' মানে যে গতিশীল, এ কথা অনেকেই জানত না। জীবনে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করেছেন, গায়ে মাখেননি।

বলাইদার কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প শুনেছি। প্রায়ই ভাগলপুর থেকে বাড়ির সন্দেশ হাতে করে কিউল প্যাসেঞ্জারে চড়ে শান্তিনিকেতনে যেতেন। আবার দশটার ট্রেনে ফিরে আসতেন। একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে সদ্য লেখা 'পরমাণুলোক' পড়ে শোনান। বলাইদা বললেন, 'জানো, শুনতে শুনতে আমার বুক কাঁপতে লাগল। ভাবলাম এ মানুষটি কে! পড়া শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম লাগল, বলাই? বললাম, এখন কিছু বলতে পারছি না, পরে জানাবো। জানো, ফেরার পথে সারাটা ট্রেন ছটফট করেছি। যন্ত্রণায় নয়, আনন্দে— মানুষের সীমাহীন ক্ষমতা দেখে কেমন আনন্দ হয় তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। ভাগলপুরে ফিরে পরমাণু নিয়ে একটা কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে পূজা সাঙ্গ করলাম। একবার রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে বিদায় নেওয়ার সময় হঠাৎ বললেন, বলাই, তোমায় কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কি দিই বলো তো? সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আপনার ব্যবহৃত একটা কলম, আপনার একটা পুরনো জামা। রবীন্দ্রনাথ তা-ই দিয়েছিলেন।'

মাইকেল মধুসূদনের উপরে একটি নাটক লিখেছিলেন বলাইদা, 'শ্রীমধুসূদন'। রবীন্দ্রনাথ পড়ে বলেছিলেন, সবই তো ভাল, শেষ দৃশ্যে ভূত-টূত আনতে গেলে কেন? বলাইদা উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে কি? হ্যামলেটেও তো ভূত ছিল। আমি তো জীবনী লিখিনি, নাটক লিখেছি।

রবীন্দ্রনাথ যে এই যুক্তি মানতে পারেননি, সেটাও বলেছিলেন বলাইদা।

একবার বম্বে যাচ্ছি। অরুন্ধতী বললেন, 'শুনলাম বলাইদার শরীর ভাল যাচ্ছে না—যাবার পথে একবার দেখা করে যেও।' সেইমতো গিয়ে দেখি অসুস্থ হলেও একটা আতস কাচ চোখে ধরে লিখছেন। আমি যাওয়া মাত্র সন্দেশ আনার হুকুম হল। আপত্তি জানাতে বললেন, 'খাও, খাও। এখন তো সব বাতাসা সাইজের সন্দেশ। এক-আধটা খেলে কিছু হবে না।' বলে নিজেই টপাটপ দুটো সন্দেশ মুখে পুরে দিলেন। সদ্য প্রকাশিত একটি বইও দিলেন আমাকে, নাম 'লী'। 'লী' মানে যে মিলন তা জানতাম না। আব্দার করে বললাম, 'অনেকদিন সেই ছোট্ট গল্প লেখেন না। বড় ভাল লাগত। আবার দু-একটা লিখুন না।' বললেন, 'আজকাল আর মাথায় আসে না। তবে একটা গল্প ভেবে রেখেছি।' সেই গল্প শোনালেন এক মিনিটে। বিস্ময়কর চরিত্র বিশ্লেষণ। গল্পটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারেননি। বলাইদার মৃত্যুর পর 'বনফুলের শেষ' ছোট্ট গল্প' নাম দিয়ে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখেছিলাম যুগান্তরে। কিন্তু, আমি কোথায় পাবো সেই কলমের জোর আর সংযম!

বিমল মুখার্জি আমার ক্যামেরাম্যান ছিলেন দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর। শরীরটা তাঁর চিরকালই ক্ষীণ, কিন্তু অসম্ভব পরিশ্রমী ছিলেন, দিনে দশ-বারো ঘণ্টা টানা দাঁড়িয়ে কাজ করতেন। চেয়ার বা মোড়া এগিয়ে দিলেও বসতেন না। বিরল চরিত্রের মানুষ। কোনও দিন ওঁর মুখে কারও সম্পর্কে কোনও বিরূপ সমালোচনা শুনিনি। চরিত্রে আভিজাত্য ছিল। বাইরে ভিতরে এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ। রাজস্থানের মরুভূমি থেকে উদয়পুরের লেক, আরাবল্লী পাহাড়ের আড়ালে কুণ্ডলগড়, হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়, বরফে ঢাকা হিমশীতল রোটাং পাস, রহস্যে ঘেরা আন্দামান, নেফার দুর্ভেদ্য অরণ্য—আমার সঙ্গে কোথায় না টো-টো করে শুটিং করে বেড়িয়েছেন। আমাকে নিয়ে হাজার হাজার মাইল গাড়ি চালিয়েছেন নিজেই। কখনও কোনও ক্লান্তি দেখিনি, কোনও অভিযোগ শুনিনি। ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে বিদেশ থেকে অনেক ম্যাগাজিন আনাতেন। ফোটোগ্রাফির অনেক অজানা তথ্য জানতাম তাঁর কাছে। টেক্‌নোলজির অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতেন। কাজও করতেন সুন্দর, বিশেষ করে স্টুডিয়োর মধ্যে সুষমামণ্ডিত রাতের দৃশ্য তোলায় তাঁর জুড়ি ছিল না। কাজের ক্ষেত্রে কোনও দিন আপস করতেন না। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা শুধু আমার ক্যামেরাম্যান হিসাবেই ছিল না—তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। তাঁর অসুস্থতার সময় অন্য ক্যামেরাম্যান নিয়ে 'আদমি ঔর আউরত' ছবি করতে কষ্ট হয়েছিল, বেশ অসহায় বোধ করেছিলাম। তারপর তো একদিন চলেই গেলেন। তাঁকে যত শক্ত শট্ দেওয়া হত ততই

খুশি হতেন। শিশুর মতো হেসে বলতেন, 'খুব মজা লাগছে।'

আজ সৌমিত্র চ্যাটার্জিও একই কথা বলেন, ভাল চরিত্র পেলে বলেন, 'এক হাত লড়ে যাব।'

সৌমিত্র অনেক গুণের অধিকারী। এখনও প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া লেখার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন অভিনয় করার অবসর সময়ে। উত্তমকুমারের মতো সৌমিত্রও সব সময় তৈরি হয়েই শুটিং-এ আসেন। এই গুণটা মনোজ মিত্র এবং নির্মলকুমারের মধ্যেও দেখেছি। তাই সব ছবিতে এঁদের নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছে করে।

বনফুলের কথায় ফিরে আসি। স্থির করলাম 'হাটে বাজারে' নিয়ে ছবি করব। এই ভাবনার পিছনে বোধ হয় ভাগলপুর-প্রীতি কাজ করেছিল। বলাইদাকে বলতে তিনি শুধু বললেন, 'এটা তো একটা ডাইরির ফর্মে লেখা। ছবি কী করে হবে?' বললাম, 'চরিত্রগুলো তো জীবন্ত!' উত্তরে বললেন, 'দেখো, তোমার যেন কোনও ক্ষতি না হয়।'

ওই ছবিতে বম্বের দুজন শিল্পীকে নিয়ে কাজ করার কথা ভাবলাম। অশোককুমার আর বৈজয়ন্তীমালা। তখন সবার উপরে এই দুই শিল্পীর নাম। এঁরা ব্যস্তও প্রচণ্ড। আমি বম্বে গিয়ে কথা বলাতে দুজনেই খুব উৎসাহিত বোধ করলেন।

বৈজয়ন্তী একবর্ণ বাংলা জানেন না। কিন্তু এই চরিত্রটি করতে খুবই আগ্রহ দেখালেন। আমি তাঁকে হোটেলে এনে অভিনেয় চরিত্রের সংলাপ টেপরেকর্ড করে দিলাম। তিনটি স্পিডে টেপ করেছিলাম প্রতিটি সংলাপ। একটি অত্যন্ত আস্তে ও টেনে টেনে, যাতে উচ্চারণ বুঝতে পারেন। দ্বিতীয়টি মাঝারি স্পিডে। তৃতীয়টি যেভাবে বলবেন, সেই স্পিডে। তার আগে ইংরেজিতে পুরো স্ক্রিপ্ট্ পড়ে দিয়েছিলাম। শুটিং-এর অবসরে গুনগুন করে তান ভাঁজা শুনেই বুঝেছিলাম বৈজয়ন্তী গান গাইতে পারেন। ঠিক করলাম ওঁকে দিয়ে ওঁর চরিত্রের গান গাওয়াবো। কিছুতেই রাজি নন। একদিন শুটিং-এর শেষে বললাম, পরদিন সকালে আমিই গ্র্যান্ড হোটেল থেকে ওঁকে তুলে নিয়ে আসব। অন্য স্টুডিয়োতে কাজ হচ্ছে, ড্রাইভার চিনতে পারবে না। বৈজয়ন্তী কিছুই বুঝতে পারেননি। পরদিন একেবারে নিয়ে হাজির নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিয়োর রেকর্ডিং থিয়েটারে। আগেই অলোকনাথ দে, রাধাকান্ত নন্দী প্রভৃতি মিউজিসিয়ানদের বলে রেখেছিলাম। বৈজয়ন্তী আর আপত্তি করেননি। সে-বছর এইচ. এম. ভি. সর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ গানের একটি অ্যালবাম বের করে। বৈজয়ন্তীমালার গানও স্থান পেয়েছিল তাতে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে অশোককুমার এক প্রবাদ পুরুষ। সেই ১৯৩৬ সাল থেকে ভারতীয় ছবিতে অভিনয়ের নতুন পথ দেখিয়েছেন। তাঁর সাধনা

একটাই, কী করে স্বাভাবিক অভিনয় করা যায়। অভিনয়ে চিরকাল কাজে লাগিয়েছেন বুদ্ধিকে। অশোককুমারের চোখ আর হাসির কোনও তুলনা হয় না। ঝর্নার জলের মতো হাসি—সহজ, সরল—স্টেজ অ্যাক্টিং থেকে অনেক দূরে। আমাকে বললেন, 'বাঙালি হলেও, বাংলা ভাষার ওপর দখল একেবারে নেই। যা শিখেছি মায়ের কাছে। অভিনয় করতে গেলে ভাষার ওপর দখল থাকা চাই। তাই সংলাপ যদি একটু কম করে দাও তাহলে আমার সুবিধে হবে।' আমি তাঁর দু-একটি বাংলা ছবি দেখে 'হাটেবাজারে' ছবিতে তাঁর চরিত্রের সংলাপ যথাসম্ভব কম রেখেছিলাম। খুশি হয়েছিলেন।

গৌরকিশোরকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গে লোকেশান দেখতে বের হলাম। ঘুরতে ঘুরতে রেডব্যাঙ্ক-এ চা বাগানের কাছে ভুটানে মনের মতো লোকেশান পেলাম।

শুটিং চলাকালে অশোককুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড হাঁপানির টান। বেশ বিপদে পড়েছিলাম। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে বিপদের কথা জানাতে উনি একটি ছোট্ট প্লেনে ডাঃ ছেত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন। ডাঃ ছেত্রী দু-তিন দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন আশোককুমারকে।

আমার তখন একটিই ভাবনা—কী করে শুটিং শেষ করব। দ্বিতীয় দিন ভোরবেলায় অশোককুমার ছাড়া অন্য শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার তোড়জোড় করছি, হঠাৎ দেখি অশোককুমার সেজেগুজে তৈরি। হাঁপানির টান, তবুও কাজ করতে চান। বললেন, 'সাফ সাফ বলছি, হয় আমাকে কাজ করতে দাও না হলে বম্বে পাঠিয়ে দাও।'

কাজ শুরু হল। বিস্ময়ে লক্ষ করেছি, ক্যামেরা চলার আগে পর্যন্ত হাঁপানির টানে হাপরের মতো বুক ওঠানামা করছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যেই ক্যামেরা চালু হল—মুহূর্তে সব কষ্ট কোথায় মিলিয়ে গেল। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। চোখের সঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে নিপুণভাবে অভিনয় করে গেলেন। শটের শেষে বললেন, 'তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার দাও, দাঁড়াতে পারছি না, মরে যাব।'

কাজের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে সেরেও উঠলেন।

অনেকেই জানেন না, অশোকুকমার শুধু একজন জাত অভিনেতাই নন, নানা গুণের অধিকারী। প্রথম জীবনে জার্মান আর ফরাসি ভাষা শিখেছেন। ভাল ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা অজস্র অয়েল পেন্টিং আছে। একটি বিখ্যাৎ ছবির প্রিন্টও বেরিয়েছে। ছবিটি একটি অবাধ্য ঘোড়ার। আয়নায় দেখে নিজের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। তাঁর সাত আটখানা গাড়ি ছিল। তার মধ্যে একটা রোলস্-রয়েস। প্রত্যেকটি গাড়ির ইঞ্জিন সম্বন্ধে

ওয়াকিবহাল ছিলেন। গাড়ি খারাপ হলে নিজে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রি দিয়ে ঠিক করাতেন। এ ছাড়াও একজন পয়লা নম্বরের শৌখিন শব্দযন্ত্রী। আট-দশটা নানা সাইজের টেপরেকর্ডার নিয়ে কত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, কল্পনা করা যায় না।

জীবনকে নিবিড়ভাবে ভাল বেসেছেন অশোকুমার। তাই জীবনের এতটুকু সময় নষ্ট করেননি। আজ আশি বছর বয়সেও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা চিরনবীন ও অদ্বিতীয় তিনি। বছর দুই আগে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে দেখা হয়। তিনি চেয়ারম্যান। ডায়াসে রাষ্ট্রপতির পাশে বসেই চিৎকার করে বললেন, 'তপন, একসঙ্গে ফিরব। পালিও না আবার!' প্রোটোকলের ধার ধারেননি।

সেই রাতে একসঙ্গে অশোক হোটেলে মন্ত্রীর পার্টিতে গেলাম। গিয়ে দেখি অনেক খাবারের মধ্যে একপাশে একটি লোক জিলিপি ভাজছে। বললাম, 'জিলিপি খাবেন?' বললেন, 'চলো।' একটা জিলিপি মুখে দিয়ে বললেন, 'খুব ভাল। তবে ভাই ভাগলপুরের সেই জিলিপির মতো নয়।'

খোসলা এন্‌কোয়ারি কমিটির মিটিং চলছে বম্বেতে। আমিও একজন সদস্য ছিলাম। অন্য সদস্যরা সকলেই খ্যাতিমান মানুষ। আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক আর. কে. নারায়ণ, গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রবীন্দ্র-ভক্ত উমাশঙ্কর যোশী, সাংবাদিক রমেশ থাপার। মিটিং চলছে, এমন সময় হঠাৎ দিল্লি থেকে খবর এল 'হাটে বাজারে' রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে অশোককুমারকে টেলিফোনে খবরটা দিই। উনি খুব খুশি হয়ে বললেন, 'আজ জমিয়ে সেলিব্রেট করব। তোমার মিটিং কখন শেষ হবে?' বললাম, 'পাঁচটার সময়।' বললেন, 'আমি ছ'টার সময় তোমাকে হোটেল থেকে তুলে নেব।' ভাবলাম খেয়ালি মানুষ, কে জানে হয়তো চল্লিশ-পঞ্চাশজন বন্ধুবান্ধব ডেকে বিরাট কিছু করে ফেলবেন। বেশ সঙ্কোচ লাগল। সন্ধ্যা ছ'টায় পাজামা পাঞ্জাবি পরে ছোট মেয়ে পালুকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসে তুলে নিলেন আমাকে। আমরা তিনজনে মেরিন ড্রাইভে দু ঘণ্টা চক্কর দিলাম। আইসক্রিম খেলাম। একসঙ্গে গলা ছেড়ে গান গাইলাম। এইরকম অন্তরঙ্গতার মধ্যেই সেলিব্রেশন শেষ হল।

গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটি নিয়ে ছবি করার কথা অনেক দিন ধরে মাথায় ঘুরছিল। কিন্তু আমি পলিটিক্স বুঝি না—রাজনীতি থেকে কয়েকশো মাইল দূরে জীবন কাটিয়েছি বলে সাহস হচ্ছিল না। এবার ভাবলাম একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক।

প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলি, যাঁর হয়ে 'ক্ষুধিত পাষাণ' করেছিলাম, প্রায় দশ বছর অপেক্ষা করেছিলেন আমার জন্য। অন্য কারও সঙ্গে ছবি করতে চাইতেন না। হেমেনবাবুকে প্রস্তাব দিতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে

গেলেন। বললাম, 'সাগিনা চরিত্রে দিলীপকুমার হলে কেমন হয় ? ও তো অনেক দিন ধরে আমার সঙ্গে বাংলা ছবি করতে চাইছে।' হেমেনবাবু বললেন, 'খুব ভাল হয়।'

হেমেনবাবু পাক্কা সাহেব, দুদিন পর রাঁচি থেকে ফোন করে বললেন, 'পরশু আপনাকে নিয়ে মাদ্রাজ যাব। দিলীপ মাদ্রাজে শুটিং করছে। ওর সঙ্গে কথা হল। আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।'

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন হেমেনবাবু। ইংরেজি এবং সংস্কৃতে এম. এ.-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরি। তাঁর আভিজাত্য ছিল দেখবার মতো। কাজের সময় নির্ভেজাল ইংরেজ।

মাদ্রাজ পৌঁছলাম। দু পাতার মধ্যে সংক্ষেপে 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটি ইংরেজিতে লিখে দিলীপের হাতে দিলাম। পরদিন জানালো ছবি করতে রাজি। তবে মাস তিনেক পরে শুরু করতে হবে। তার মধ্যে মাদ্রাজের ছবিটা শেষ হয়ে যাবে। দিলীপকুমার সম্ভবত ভারতবর্ষের একমাত্র অভিনেতা যিনি একসঙ্গে কখনও দুটি ছবি করেননি। টাকার অঙ্কটাও পারিশ্রমিকের হিসাবে বিরাট ছিল। তবে আমাদের ছবিতে বলতে গেলে কিছুই নেননি। অভিনেতা হিসাবে এক বিরাট প্রতিভা। আমি বলতাম, 'তুমি আমাদের ভারতবর্ষের তোসিরো মাফুনি।' দিলীপের অভিনয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ করতাম। একটা শট তিনবার নিলে নিজের অজান্তে তিন রকমের রঙ চড়াতেন। খেয়াল গাইয়ের মতো মাঝখানে অনেক কাজ করে সহ-অভিনেতা বা অভিনেত্রীর যাতে সুবিধা হয় সেজন্য একই জায়গায় এসে ছেড়ে দিতেন।

গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল আমাদের মধ্যে। আজও সেই বন্ধুত্ব অটুট আছে। দিলীপ দারুণ বক্তা। উর্দু আর ইংরেজি ভাষায় ওর বক্তৃতা শোনবার মতো। আমরা একসঙ্গে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেছি। তখন ডক্টর শিউলঙ্কর ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রদূত। তিনি সন্ধ্যায় খেতে ডাকলেন। মস্কো টেলিভিশন এল আমাদের ইন্টারভিউ নিতে। দিলীপ দশ মিনিটের মধ্যে এত সুন্দরভাবে ভারতবর্ষের ছবির কথা বললেন যে আমরা সবাই চমকিত। আমার মনে আছে দিলীপ বলেছিলেন, একমাত্র তখনই ভাল ছবি করা সম্ভব যখন দর্শক ভাল ছবি চাইবেন। ভাল ছবি চাওয়ার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ আছে। যে দেশে এত নিরক্ষরতা, সেখানে ঢালাও ভাল ছবি কি করে সম্ভব ? প্রযোজকই বা টাকা ঢালবে কেন ? তাই বাধ্য হয়ে আমাদের গরিব, অশিক্ষিত, অসহায় মানুষের কাছে অবাস্তব স্বপ্ন বিক্রি করতে হয়।

সেই সময় মস্কোতে ছিলেন জাপানের কুরোসাওয়া। তিনি ইংরেজি জানেন না। দোভাষীর মাধ্যমে প্রথমেই সত্যজিৎ রায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মনে আছে পরে বলেছিলাম, 'একবার টোকিওতে তিন-চার দিন

ছিলাম, অনেক চেষ্টা করেও আপনাকে ধরতে পারিনি।' কুরোসাওয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সালে?' বললাম, '১৯৬২—আপনি সেই সময় টোকিওর বাইরে ছিলেন।' কুরোসাওয়া বললেন, 'তাহলে হয়তো কোনও গ্রামে গিয়ে মেঘের পিছনে ছুটছিলাম।'

একবার বম্বে গেছি। দিলীপ তখন বম্বের শেরিফ। ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি একখানা বিরাট দন্ত চিকিৎসার বই পড়ছেন। বললাম, 'কী ব্যাপার! হঠাৎ এই বই পড়া?' হেসে জবাব দিলেন, 'আজ ডেন্টিস্টদের একটা সভায় বক্তৃতা দিতে হবে, তাই পড়ে নিচ্ছি।'

১০

বম্বের অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রী, শিল্প-নির্দেশক, ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের দক্ষতা আন্তর্জাতিক মানের। ওয়াহিদা রহমান ও সুনীল দত্তকে খুব পছন্দ করতাম। ওয়াহিদা হয়তো নানা ধরনের চরিত্র করার সুযোগ পাননি, পেলে তাঁর অভিনয় প্রতিভার বিশদ পরিচয় আমরা পেতাম।

একদিন বম্বের কাগজে দেখলাম, তারাশঙ্করদা আর নেই। সারাদিন কাজে মন দিতে পারিনি, মনে হল অতি প্রিয় একজন চলে গেলেন। কলকাতায় ফিরে সন্তোষকুমার ঘোষকে টেলিফোন করলাম। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।' সেদিন সকাল ন'টা থেকে তিন ঘণ্টা তারাশঙ্করকে নিয়ে নানা কথা হল। সন্তোষবাবু সেসময় বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন, কিন্তু নিজেই বললেন, 'বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করকে উপেক্ষা করার মতো সাহস কার আছে!' সেদিন ফিরে যাওয়ার সময় ম্লান মুখে আরও একটা কথা বললেন, 'তারাশঙ্করের প্রয়াণে একটা শোকসভার আয়োজন করেছিলাম। বিশেষ কেউ আসেনি।' পরে আরও কোনও কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইরকম হতে দেখেছি। আমরা বোধহয় শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা জানাতে পারি না।

বম্বের দুটি ছবিতেই সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন শচীনদেব বর্মন। এক মন উদাস-করা সন্ন্যাসী গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁর জীবনের জপমন্ত্রই ছিল গান। বড় ভাল বেসেছিলেন আমাকে। বম্বে থাকাকালে প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। হারমোনিয়াম টেনে দিতাম, শুনতাম তাঁর পুরনো গান। কখনও কথা ভুলে গেলে জুগিয়ে দিতেন অরুন্ধতী। আজ মনে হয় সে যেন এক স্বপ্নের জগৎ ছিল। বলতেন, 'জানো, এখন এই পুরনো গানগুলো অনেক ভাল করে গাইতে পারি, কিন্তু গলা চলে না।'

চিরকাল কলকাতার জন্য তাঁর মন ছটফট করত। বলতেন, 'দূর, যে দেশে গঙ্গা নাই—সেটা আবার দেশ নাকি!'

বম্বেতে শচীনদার মতো সম্মান আর কোনও বাঙালি পেয়েছেন বলে জানি না। একবার আমি একা গেছি। দেখলাম, উনি একটি সুর করছেন। আমাকে বললেন, 'শোনো তো, একটা গানের সুর করেছি—কীরকম লাগছে? লতা গাইবে।' শোনালেন, সেই বিখ্যাত গান : 'মেঘছায়ে আঁধি রাত'। ওঁর দরদি কণ্ঠে মল্লার ঘেঁসা সুর—আমার চোখ সজল হয়ে এল। বললাম, 'খুব সুন্দর হয়েছে।' উত্তরে বললেন, 'আরে রাম রাম—একি আমার নিজের! সবই রবীন্দ্রনাথের কৃপায়।'

অনেক গল্প শুনেছি শচীনদার কাছে। রাজ পরিবারের ছেলে, মানুষও হয়েছিলেন সেই স্টাইলে। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তেন, টেনিস খেলতেন সাউথ ক্লাবে। কলকাতায় কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছে গান শিখেছেন, পরে ভীষ্মদেবের কাছে। শচীনদেবের প্রথম দিকের অনেক গানে এঁদের প্রভাব বেশ বোঝা যায়। গল্পও অনেক। এক মেঘলা দুপুরে নিজে একা হারমোনিয়াম নিয়ে গুনগুন করছেন, এমন সময় কাজী নজরুল ইসলাম এলেন। দরজা থেকেই বললেন, 'আরে, মুখটা তো বেশ করেছ, শচীন! দাঁড়াও, একটা কাগজ পেন্সিল দাও।' পনের মিনিটের মধ্যে গান লিখলেন। সুর বসাতে ঘণ্টা খানেক। পরের দিনই রেকর্ডিং হল। বিরাট হিট গান—'মেঘলা নিশি ভোরে, মন যে কেমন করে।' এইরকমই কত গল্প। বৌদি বলতেন, 'শচীনদা যখন ফিল্মস্তানের কাজ করতেন তখন রোজ দুটো করে টাকা সঙ্গে নিতেন। পরবর্তীকালে যখন লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন তখনও কোনও তফাত হয়নি। ওঁর কাছে দু টাকা আর দু লক্ষ টাকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি সীমাহীন টান ছিল শচীনদার। আমি গানের কথাগুলি আউড়ালেই দেখতাম তাঁর চোখ মুদে আসছে। বলতেন, 'গান দিয়ে শুধু ঈশ্বরের পুজো করে গেছেন।'

বম্বের ছবির পালা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শুধু কিশোরকুমারের একটি গান রেকর্ডিং বাকি ছিল। শচীনদা সুর করে রেখেছিলেন। নানা কাজের মধ্যে আমার আর শোনা হয়নি। তখন আমি পালি হিল্‌স্‌-এ নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকি। একদিন সন্ধ্যায় শুটিং থেকে ফিরে দেখি শচীনদা হারমোনিয়াম, তবলা নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করছেন। বললেন, 'রেকর্ডিং-এর আগে তুমি একবার শুনবে না?' বললাম, 'খুব প্রয়োজন দেখছি না, বিশেষত আপনি স্বয়ং যেখানে সঙ্গীত পরিচালক।' বললেন, 'ধ্যুৎ! তা হয় নাকি! তুমি পরিচালক, সব কিছু তোমার নির্দেশে হবে।' এই রকমই ছিল তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা।

ছবি শেষ করে কলকাতায় ফিরলেও বিভিন্ন প্রয়োজনে বম্বে যাতায়াত অব্যাহত ছিল। একবার বম্বে গিয়ে দিলীপকুমারকে টেলিফোন করি।

দিলীপ নেই, টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে সায়রাবানু বললেন, 'সাহেব হায়দরাবাদ গেছেন, পরশু ফিরবেন।' তারপরেই, 'দাদা, আপনি শুনেছেন, শচীনদার স্ট্রোক হয়েছে?' আমি তো থ। আমার নির্বাক অবস্থা বুঝে সায়রাবানু বললেন, 'শচীনদা বম্বে হসপিটালে আছেন। আমি আপনাকে বেলা চারটের সময় তুলে নিয়ে যাব।'

বম্বে হসপিটালে গিয়ে শচীনদাকে দেখলাম। শরীরের বাঁদিক পক্ষাঘাতে অচল। আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে প্রায় বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'তপন, আর কিছু চাই না—একটু যদি গুনগুন করে গান গাইতে পারতাম!' সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই পারবেন। বড়ে গোলাম আলি সাহেব একটা স্ট্রোকের পরেও গান গেয়েছেন। আমি নিজের কানে সে-গান শুনেছি, শচীনদা।'

কিন্তু, কিছুতেই কিছু হয় না—মৃত্যু চলে নিজের খেয়ালে। কলকাতায় ফেরার কিছুদিন পরে এক সকালে সন্তোষকুমার ঘোষের টেলিফোন এল। বললেন, 'এখুনি আনন্দবাজার থেকে খবর এল শচীনদা চলে গেছেন।'

প্রেমেনদার খুব দুঃখ ছিল কেন তাঁর কোনও গল্প নিয়ে ছবি করার কথা ভাবি না। একবার তো অরুন্ধতীকে বলেই ফেললেন, 'তপন আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।' আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'এসব কথা বললে আমার ওপর অবিচার করা হয়, প্রেমেনদা। আপনার মতো বিরল প্রতিভার সান্নিধ্য পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।' কখনও তাঁকে বলেছি, 'শুধু শুধু ফিল্মে এসে জীবনের অনেকটা সময় নষ্ট করলেন কেন!' প্রেমেনদা মানতেন না। বলতেন, 'জীবনকে উপভোগ করার জন্যে নানারকম কাজ করে আনন্দ পাওয়াটাই বড় কথা।'

রসিক মানুষ ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মাঝে মাঝে এমন এক একটা উপমা দিতেন যে হেসে গড়িয়ে পড়তাম। একদিন সকালে তারাশঙ্করদার বাড়িতে গিয়ে দেখি প্রেমেনদা বসে আছেন। রেডিয়োর কী একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছে দুজনে। একজন হঠাৎ-সাহিত্যিকের কথা উঠতে প্রেমেনদা বললেন, 'একটা শিম্পাজির হাতে কলম দিলে ওর চেয়ে ভাল লিখত।' তারাশঙ্করদাকে এত সশব্দে হাসতে শুনিনি কোনও দিন।

আমার দুর্ভাগ্য, সেই প্রেমেনদার 'মহানগর' গল্প অবলম্বনেই দূরদর্শনের জন্য হিন্দিতে ছবি করলাম 'দিদি'। কিন্তু, ততদিনে তিনি চলে গেছেন। বেঁচে থাকলে সেই ছবি দেখে কতটা আনন্দ পেতেন বা কী বলতেন জানি না।

বাংলা ছবি করছি অথচ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করব না তা আবার হয় নাকি! এই অজাতশত্রু মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। আমার 'ক্ষণিকের অতিথি', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' আর

'আরোহী' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন হেমন্তবাবু। সব সময় চাইতেন কোনও নতুন শিল্পীকে দিয়ে গান গাওয়াতে। আমিও বাধা দিতাম না।

হেমন্তবাবুর একটা ব্যাপার খুব ভাল লাগত। সবাই জানেন বাঙালির ঘরে ঘরে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত পৌঁছে দিয়েছেন। এমনই ছিল তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রীতি। কিন্তু, নিজে যখন সুর করতেন তখন তাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনও প্রভাব থাকত না। অথচ সেসব গানের গীতিকারের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব থাকত পুরোমাত্রায়। রবীন্দ্র-অনুসৃত কথার উপর সুর দেওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

বড় পরোপকারী মানুষ ছিলেন হেমন্ত। একবার লণ্ডন থেকে তাঁকে বম্বেতে জানালাম জগদীশচন্দ্র বসু ডকুমেন্টারির রেকর্ড করতে হবে। আমি ফেরার পথে বম্বেতে, বার্কলে হিলকে দিয়ে করাতে চাই। বম্বে পৌঁছে দেখি, সাউণ্ড স্টুডিয়ো ঠিক করা, বার্কলের সঙ্গে কথা বলা, আমার জন্য হোটেল ঠিক করা, সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। আমার হাত তখন খালি। হেমন্তই টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে একদিনে কাজ শেষ করে পরদিন কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। এমন উদার হৃদয় মানুষ চট করে দেখা যায় না। কত যে গরিব, অসহায় ছেলেকে খরচ দিয়ে পড়িয়েছেন, কত গায়ক এবং সঙ্গীত পরিচালকের মৃত্যুর পর তাঁদের পরিবারকে সাহায্য করে এসেছেন, তা আজকের দিনে কল্পনাতীত। কিন্তু, এসব নিয়ে কোনও হামবড়াই ছিল না। সবটাই গোপন রাখতেন, কাউকে জানতে দিতেন না। এমন মানুষের সঙ্গ পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

১১

জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে তাঁদের কথাই আজ বেশি করে মনে পড়ে যাঁরা ছিলেন, এখন নেই—যাঁদের সান্নিধ্য, হৃদয়গুণ ও প্রতিভার সংস্পর্শ আমাকে সুখে দুঃখে পূর্ণতার স্বাদ দিয়েছে।

স্টুডিয়োতে একটি ঘরে টানা তিরিশ বছর কাটিয়েছি। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা। তিরিশ বছরের সেই ঘরে বসে দেশি, বিদেশি, ছোট, বড়, বিদগ্ধ, ঘুঘু ইত্যাদি কত যে চরিত্র দেখেছি তা লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। ভারত এবং ভারতের বাইরে বন্ধুদের বিরাট দীর্ঘ মিছিল আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

অনেকের ধারণা, আমার জীবন কেটেছে খুব সুন্দর ও মসৃণভাবে—একেবারে মার্বেল পাথরে পা দিয়ে হেঁটেছি। মোটেই তা নয়। দুঃখও পেয়েছি অনেক। প্রবঞ্চিতও হয়েছি। শুনেছি নির্লজ্জ মিথ্যাচার। রাজনীতির শিকার হয়েছি। আমার বিরুদ্ধে হুইসপারিং ক্যাম্পেনও হয়েছে। 'আপনজন' ছবিটি নাকি সি. আই. এ-র টাকায় করেছিলাম। 'আতঙ্ক' ছবি না দেখেই বেজায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এক মন্ত্রীমশাই। সবিস্তারে সেসব কথা না-ই বা বললাম। যখন ভাগলপুরের স্কুলে পড়ি তখন আমার বন্ধু নীলু একটা কবিতা লিখেছিল—

'হিটলার হয়েছেন ক্রুদ্ধ,
সকলে তাঁহার কাছে
নিবেদন করিয়াছে,
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সুদ্ধ।'

সে-কবিতা শুনে সবাই প্রচণ্ড হেসেছিলাম। মন্ত্রীমশাই ক্রুদ্ধ হওয়াতেও সেইরকম হাসি পেয়েছিল। শুনেছি পাবলো নেরুদা একনিষ্ঠ ভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। চিলি'র এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতেন দুঃস্থ শ্রমিকদের কবিতা শোনাতে। সেই কবিতায় থাকত নতুন সূর্যস্নাত দীপ্ত মানবের কথা। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর বন্ধু ছিল। পিকাসো, এলিয়ট, মারকেজ এবং আরও অনেককে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

সত্ত্বেও শ্রদ্ধা করতেন নেরুদা। নেরুদার প্রতি জওহরলাল নেহরুর অশিষ্ট ব্যবহার সর্বজনবিদিত। সেই নেরুদা লেনিন শান্তি পুরস্কারের জন্য নেহরুর পক্ষে ভোট দেন। অন্যের মতকে সম্মান দেওয়াও তো সভ্যতার অঙ্গ। আমাদের মন্ত্রীমশাইয়ের সেই বোধ ছিল কি না জানি না। এমনই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে পরবর্তী কালে শিশুদের জন্য করা আমার একটি ছবি—যা স্বাভাবিক ভাবেই করমুক্ত হয়—আটকে দিলেন, শিশুদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলেন। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত সে-ছবি করমুক্ত হয়েছিল।

আমার স্টুডিয়োর ঘরের জানলা দিয়ে অনেক গাছ দেখা যেত। ফলসা, আম, বাতাবিলেবু, সবার পিছনে মাথা উঁচু করে একটি রাধাচূড়া। মার্চ মাসে আমলকির মুকুল আসত। সোনার রঙ লাগত রাধাচূড়ায়। ভাল লাগত না। কারণ পরবর্তী তিন-চার মাস আউটডোরের কাজ বন্ধ থাকত। অপেক্ষা করতে হত সেই শরৎ, হেমন্তের দিনগুলির জন্য।

যাঁরা আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন সেই সহকর্মীদের প্রায় সকলেই চলে গেছেন। মাত্র দুজন এখনও জীবিত। সম্পাদক সুবোধ রায় আর সহ-পরিচালক বলাই সেন। বয়সের ভারে এখন দুজনেই কাহিল। আর আছে গৌর দাস, আমার প্রোডাকশন অ্যাসিস্টান্ট। প্রতি রবিবার এসে দেখে যায় আমাকে। গৌর আর বনমালী চিরকাল আমার সঙ্গে কাজ করে এসেছে।

বনমালীর কুষ্ঠ হয়। ওকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে আমার ঘরে যত কাপ প্লেট ছিল সব স্টুডিয়োর বাইরে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলতে বলি। অনেক শিশুও যে ওই ঘরে আসত। ভয় হয়েছিল তাদের জন্যই। একদিন ডাক্তার জানালেন বনমালীর কুষ্ঠ ছোঁয়াচে নয়। সবার মত নিয়ে আবার কাজে বহাল করলাম তাকে। দুদিন স্টুডিয়োয় না গেলে তৃতীয় দিন বনমালী বাড়ি এসে হাজির হত। বলতাম, 'কী ব্যাপার? কিছু চাই?' মাথা নিচু করে বলত, 'না, দুদিন আপনাকে দেখিনি। ভাল লাগছিল না। দেখতে এলাম।' সেই বনমালীও চলে গিয়েছে।

গৌর আর বনমালী কীভাবে যে আমাকে আগলে আগলে রাখত, কত যত্ন—কত আন্তরিকতা ও ভালবাসা দিয়ে তা বলার নয়। শীতকালে কাজের শেষে স্টুডিয়ো ফ্লোর থেকে বেরলেই দেখতাম, আমার কোট হাতে বনমালী দাঁড়িয়ে। শুধু ধরে থাকা নয়, নিজের হাতে পরিয়ে দিত। আউটডোরে অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছি। পরম বন্ধুর মতো গৌর আর বনমালী আমার সেবা করেছে। 'আজ কা রবিনহুড' ছবির শুটিং-এর সময় একটা হাতি যখন পায়ের চাপে আমার হাড়-পাঁজরা ভেঙে দিয়েছিল, গৌর তখন আমার বুকের সামনে একটা বালিশ আর পিঠে একটা বালিশ জড়িয়ে ধরে

দুশো মাইল পাহাড়ি পথে নিয়ে এসেছিল আমাকে। দিলীপকুমার বলতেন, 'তোমার ইউনিট যেন একটা আর্মির ইউনিট। প্রত্যেকে প্রতিটি মুহূর্তে এলার্ট হয়ে থাকে। সময় নষ্ট করে না। এরকম ইউনিট আমি আগে দেখিনি।' আমি আমার ইউনিটের জন্য গর্ব অনুভব করি।

১৯৭৮ সালে অরুন্ধতীর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়। ঠিক তার ছ' সপ্তাহ আগে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। নার্সিং হোম থেকে ফেরার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে এই বিভ্রাট ও বিপর্যয় সামলে দিয়েছিলেন স্বনামধন্য নিউরোলজিস্ট অনুপম দাশগুপ্ত। মেডিসিনে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম এফ. আর. এস.। বারো বছর ধরে অরুন্ধতীর চিকিৎসা করেছিলেন তিনি, একটি পয়সাও কোনওদিন নেওয়াতে পারিনি। তিনি আমার অতি প্রিয় বন্ধুদের একজন। আমাকে বলেন, 'আপনি শুধু ছবি করে যান। অসুখ বিসুখের ভারটা আমার।'

আর একজন বিরাট মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর ছায়ায় জীবন কাটিয়েছি। তিনি ডাক্তার সুধীররঞ্জন সান্যাল। তাঁর পিতা স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গৃহী শিষ্য শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। ডাক্তার সুধীররঞ্জন সান্যাল—সকলের সুধীরদা, আমাদের বাড়ির সবাই ডাকত ডাক্তারদা বলে।

১৯২৪ সালের ২ অক্টোবর তিনি আমার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে মাকে ভর্তি করলেন মেডিকেল কলেজে। সেখানেই ওইদিন ভূমিষ্ঠ হলাম আমি। ডাক্তারদা শুধু ডাক্তারই ছিলেন না, সত্যিকারের একজন বিজ্ঞানসাধক ছিলেন। চার বন্ধু মিলে বিবেকানন্দ রোডের উপর বিরাট ল্যাবরেটরি করেছিলেন, নাম ক্যালকাটা ব্যাকট্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট। তারই একফালি একটি ঘরে গবেষণা করতেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়ো কেমিস্ট্রিতে গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর। যন্ত্রপাতি সব নিজে হাতে তৈরি করতেন। তিরানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত বিনা পয়সায় রোগী দেখে এসেছেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত মিক্সচার ছিল—একটি পেটের, অন্যটি সর্দিকাশির। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও রোগী পাঠাতেন ওই মিক্সচারের জন্য।

কলেজে পড়ার সময় প্রায়ই বিকেলে যেতাম তাঁর কাছে। দেখতাম বার্ট্রান্ড রাসেলের সঙ্গে পত্রালাপ। আমেরিকা থেকে আব্রাহাম স্টোন এলেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে। তখন মটর ডাল থেকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বড়ি তৈরি করেছিলেন, তাই নিয়ে বিদেশে কত আলোচনা। বিখ্যাত 'ডুপন্ট' কোম্পানি পেটেন্ট করতে চেয়েছিল, দেননি। ডাক্তারদা চেয়েছিলেন সবাই এই ওষুধ তৈরি করুক যাতে অ্যাসপিরিন, অ্যাসপ্রোর মতো সস্তায় মানুষ তা কিনতে পারে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে সে-যুগে

এক লক্ষ টাকা গ্রান্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এত সরকারি নিয়মকানুন বাধ্যবাধকতা দেখে ডাক্তারদা সেটা ফিরিয়ে দিলেন। নিজে ছিলেন অকৃতদার। বলতেন, 'ইচ্ছে করলে একটা মানুষ একাই অনেক কিছু করতে পারে। যতটা পারব নিজেই করব। যেটা হবে না পড়ে থাকবে। অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক এসে করবে।'

১৯৩৮ সাল থেকে 'ল্যান্সের' জার্নালে তাঁর গবেষণামূলক লেখা বেরোত নিয়মিতভাবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের কত জিনিস নিয়ে যে কাজ করেছেন তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ক্যানসার নিয়েও কাজ করেছিলেন। প্রফেসর জে. বি. এস. হলডেন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। ডাক্তারদা তাঁর নিজের তৈরি ওষুধ দিয়ে প্রতি শনিবার ভুবনেশ্বরে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা করতেন। এক কথায় প্রফেসর হলডেন তাঁর দেহ ডাক্তারদার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্য। প্রফেসর হলডেন লিখে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারে দেওয়া হয় আর তার ফলাফল ডাক্তার সান্যালকে জানানো হয়। আমাদের দেশে কেউ জানত না, অথচ রিডার্স ডাইজেস্ট-এ তাঁর জীবনী বেরিয়েছিল। এমন আনন্দময় পুরুষ আমি দেখিনি। তাঁর বাবা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রীতি পরম সাধন ঋষিবাক্য'—এই প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই উৎসব। যে ভাগ্যবানের অন্তরে ভগবানের প্রকাশ তাঁহার চিরদিনই উৎসব। এই কথাগুলি যে ডাক্তারদারই প্রতিচ্ছবি। জীবনের কোনও দুঃখই তাঁর নাগাল পেত না।

মনে পড়ে, হয়তো কোনও রবিবার সকালে ওঁর রিসার্চ রুমে গিয়েছি, দেখি একটা মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে গুনগুন করে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছেন 'আর সময় নাহি রে'। আমাকে দেখেই বললেন, 'একবার বালিগঞ্জ যেতে হবে। যাবি আমার সঙ্গে ?'

একটা ছোট্ট 'ওপেল' গাড়ি ছিল, নিজেই চালাতেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কলকাতা। রাস্তা ঘাটে এত ভিড়, এত গাড়ি ছিল না। সারাটা পথ রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে চললেন। হঠাৎ 'ফারপো'র উল্টো দিকে গাড়ি পার্ক করে বললেন, 'চল, একটু ইটালিয়ান সসেজ খেয়ে আসি।' একবার কাটোয়া লাইন দিয়ে আমি আর ডাক্তারদা আমাদের দেশের বাড়িতে যাচ্ছি। ট্রেন ধিকি ধিকি করে চলতে চলতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, দুঃসহ গরমে সবাই কাহিল। ডাক্তারদা গার্ড সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার ?' গার্ড বললেন, 'ইঞ্জিন বিগড়েছে।' ডাক্তারদা আমাকে বললেন, 'চল তো, দেখি।' ড্রাইভার তখন ইঞ্জিনের তলায় ঢুকেছে। ডাক্তারদাও ওর পাশ দিয়ে তলায় ঢুকে গেলেন। কী সব কথাবার্তা হল জানি না। একটু

পরে ড্রাইভার ইঞ্জিনের তলা থেকে বেরিয়ে এসে একটা মোটা শক্ত তার ডাক্তারদার হাতে এগিয়ে দিল। আধ ঘণ্টা পরে কালিঝুলি মাখা পাঞ্জাবি নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আস্তে আস্তে চালিয়ে কাটোয়া স্টেশন অবধি চলো। পরে ঠিক করে নিও।' ট্রেন চলতে লাগল। যাত্রীরাও ধন্য-ধন্য করতে লাগল। আমাকে বললেন, 'একটা শ্যাফ্‌টের একদিক খুলে গেছে। তার দিয়ে বেঁধে দিলাম।'

ডাক্তারদার বাবা তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু করেন। প্রথম পূজায় শ্রীসারদাময়ী মা উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারদাও আজীবন সেই পূজা করে গিয়েছেন। নিজে নিরম্বু উপবাস করে চণ্ডীপাঠ করতেন। পাড়ার কোনও কিশোরীকে এনে কুমারী পূজা করতেন। তার পা ধুইয়ে দিয়ে প্রণাম করতেন তাকে। নারী জাতির অপরিসীম শক্তির কাছে মাথা নত আর কি! বিরানব্বই বছর বয়সেও একই ভাবে, এই গত বছরেও পূজা করে গিয়েছেন। এ বছর আর হবে না। কারণ মাস তিনেক হল তিনিও চলে গিয়েছেন। জীবনের শেষ দিকে ল্যাবরেটরিতেই থাকতেন। রিসার্চ রুমের একপাশে একটি তক্তপোষে রাত কাটাতেন। সকাল সাতটা থেকে বাঁকুড়া, বর্ধমান, বারাসাত ইত্যাদি দূর দূরান্ত থেকে রোগীদের ভিড় হত। প্রত্যেককে চিকিৎসা করতেন অন্তরের গভীর ভালবাসা দিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসুখ সেরে যেত। তা না হলে তারা আসত কেন?

আমি গেলে ল্যাবরেটরির অন্যান্য কর্মীরা অভিযোগ করে বলত, 'ডাক্তারবাবুর শরীর ভাল যাচ্ছে না, আমরা রুগীদের ফিরিয়ে দিতে চাইলে উনি বারণ করেন। আপনি একটু বলুন।'

আমি অভিযোগের কথা বলাতে ডাক্তারদা হেসে বললেন, 'রুগীদের সেবাই যদি না করব তাহলে ডাক্তার হয়েছি কেন? জীবনে তো একটা আদর্শ থাকবে?' বৃদ্ধকে বোঝাতে পারিনি, আজ আদর্শহীন জীবনই আদর্শ। আমাকে বলতেন, 'গতকালের কথা ভাববি না। নতুন দিন নতুন বার্তা, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। শরীর খারাপের অজুহাতে নিজের কাজকে কখনও অবহেলা করিস না। আর কখনও কাউকে কষ্ট দিস না।'

আজ মনে পড়ে তাঁর কথা রাখতে পারিনি। জীবনে অনেককে অনেক কষ্ট দিয়েছি। হতাশও করেছি। চিত্রপরিচালকের জীবন বড় নির্মম। নিজের নির্মমতায় নিজেও কম কষ্ট পাইনি। এইটুকুই সান্ত্বনা, শিল্প, সত্য ও সৌন্দর্যের সন্ধানে নিজের অজ্ঞাতে ও কিছুটা জেদের বশে একদিন যে-পথে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, তার শেষ কোথায় তা আজও দেখা হয়নি—সাফল্য কী তাও জানতে পারিনি, তবু দুঃখে-সুখে এই পথ চলার আনন্দ আজও আমাকে ছেড়ে যায়নি।

১৯৯৩